মোহ

বিমল কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : বিপুল গুহ

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৬৫

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু

এই লেখকের আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

খড়কুটো
গ্রহণ
বালিকা বধূ
পরিচয়
পূর্ণ অপূর্ণ
যদুবংশ
আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন
কুশীলব
একদা কুয়াশায়
মৃত ও জীবিত
ভুবনেশ্বরী
একা একা
সান্নিধ্য
দংশন

মোহ

বাস থেকে নেমে যতিকিশোর দু' চোখ বন্ধ করে ফেলল। আবার খুলল। বলল, "এ কী অবস্থা!"

সরসী পাশেই ছিল। বলল, "অন্ধকারের কথা বলছ! আজ আমাদের আলো বন্ধর দিন। সোম, বুধ, শনি। আজ শনিবার।"

বাসটা ততক্ষণে স্টপ ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছে। শব্দটা কানে লাগছিল। পেছন দিকের লাল আলো প্রথমে গাঢ়, তারপর ফিকে হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার সময় যেন বাতাসে নাচতে নাচতে চলে গেল।

জনা দুই লোক নেমেছিল, তারা বাঁ দিকের ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

যতিকিশোর অন্ধকারটা চোখে সইয়ে নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল। কলকাতায় আজকাল প্রায়ই আলো থাকছে না, তবু দোকান-টোকানের কাজ-চালানো আলোয় রাস্তাঘাটে হাঁটাচলা অনেকটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এই ঘোর অন্ধকার যতিকিশোরের চোখে লাগছিল। মাথার ওপর আকাশটুকু দেখা যায়, বাকিটা অন্ধকারে মিশে গেছে, ঠিক কোথায় যে মাটির সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে আছে বোঝাই যায় না। চারদিক দিয়ে হু হু করে বাতাস ছুটছিল। শুকনো মাটির গন্ধ, সামান্য যেন ধুলো মেশানো, গাছপালার ফিকে ঘ্রাণও জড়িয়ে আছে।

সরসী বলল, "এসো। আমায় দেখে দেখে এসো।"

যতিকিশোর হালকা করে বলল, "তোমায় দেখব কি করে?"

সরসীও হেসে বলল, "তা হলে হাত ধরো।"

যতিকিশোর সরসীর হাত ধরল না, পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

"তুমি এতো দূরে থাকো?" যতিকিশোর বলল।

"তা একটু দূর" সরসী বলল, "প্রথম এসেছ বলে আরও দূর মনে হচ্ছে।"

যতিকিশোরের মনে হল, কলকাতা থেকে আসতে তাদের বেশ সময় লেগেছে। তাও এদিকে ফাঁকা রাস্তা, বাস হাওয়ার বেগে ছুটেছে, তবু।

সরসী সাবধান করে বলল, "আস্তে এসো, গর্তটর্ত আছে, চারদিকে জঞ্জাল ছড়ানো থাকে, হোঁচট খেয়ো না।"

রাস্তাটা কাঁচা; খোয়া আর মাটি ছড়ানো, জঞ্জালও যথেষ্ট রয়েছে। যতিকিশোর সাবধানে ঢালটুকু নেমে এল। অন্ধকারে কাছাকাছি কোনো ঘর-বাড়ি চোখে পড়ছে না, সামান্য দূরে ঘন শ্যাওলার মতন রঙ-ধরা জমাট ছায়াটা বোধ হয় এ রাস্তার প্রথম বাড়ি।

যতিকিশোর বলল, "তুমি রোজ এইভাবে বাড়ি ফের?"

"না", সরসী অন্ধকারে মাথা নাড়ল, "আমি সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসি। তখন এ-দিকটা এত ফাঁকা থাকে না। রাত হয়ে গেলে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরি।"

আজ যতিকিশোরের জন্যে দেরী করেছে সরসী, চায়ের দোকানে বসে বসে যখন সে অধৈর্য তখন যতিকিশোর এল।

নীচু মতন একটা জায়গায় পা পড়তে যতিকিশোর আরও সাবধান হয়ে গেল। পিঠ নুইয়ে হাঁটছিল যতিকিশোব, প্রায় কুঁজো হয়ে। আজকাল সে এই ভাবেই হাঁটে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় ডাক্তাররা তাকে বলে দিয়েছিল, প্রথম দিকে খানিকটা সাবধানে হাঁটাচলা করবেন, দৌড়ঝাঁপ করবেন না, সিঁড়ি ওঠার সময় ধীরেসুস্থে উঠবেন; পরে সব ঠিক হয়ে যাবে, একেবারে নরম্যাল।

যতিকিশোর হাসপাতাল ছেড়েছে আজ প্রায় মাস দুই আড়াই। এতোদিন সবই স্বাভাবিক হয়ে আসা উচিত ছিল। হয়ত হয়েছে। তবু যতিকিশোর প্রথম দিককার সাবধানতা ও ভয় পুষে রেখেছে, পিঠ টানটান করলে কিংবা বড় করে পা ফেললে, নীচু হয়ে কিছু কুড়োতে গেলে তার মনে হয়, পেটের সেলাইয়ে টান লাগছে। এই টানটা সে কখনো কখনো অনুভব করে বলেই কোমর এবং পিঠ খানিকটা নুইয়ে পেটের দিকটা সঙ্কুচিত করে রাখার চেষ্টা করে।

যতিকিশোরের নিজের এটা ভাল লাগে না। সে বরাবর পিঠ সোজা, মেরুদণ্ড সিধে করে ঘুরে বেড়িয়েছে। এখন তার পিঠ নুয়ে যাচ্ছে।

সরসী বলল, "ওই আমাদের বাড়ি।"

পাশাপাশি দুটো কি তিনটে বাড়ি, অন্ধকারে কিম্ভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মেটে রঙের দু-এক ফোঁটা আলো ছিটোনো এখানে ওখানে। রাস্তার পাশে একটা লিকলিকে গাছ বাতাসের দাপটে মাথা নেড়ে নেড়ে যেন মরে যাচ্ছিল।

বাঁ দিকে মস্ত মাঠ, অসাড়।

যতিকিশোর বলল, "বড় ফাঁকা।"

সরসী বলল, "হ্যাঁ, এদিকটায় এখনও খুব ফাঁকা। সামনের দিকে অনেক বাড়ি আছে।"

যতিকিশোব কিছু বলল না। সরসী তাকে কোথায় নিয়ে এল, কোন্ প্রান্তে সে যেন বুঝতে পারছিল না।

বাড়ির সামনে এসে সরসী বলল, "এখন তোমার একটু কষ্ট হবে। আলো না আসা পর্যন্ত। গরম অবশ্য লাগবে না। বাইরে চেয়ার নিয়ে বসলে বেশ বাতাস পাবে। তবে মশা আছে।"

যতিকিশোরের হাতে একটা প্যাকেট ছিল, খবরের কাগজে মোড়া গোল ধরনের প্যাকেট। হাত বদল করে বাঁ হাতে প্যাকেটটা নিল। বলল, "তোমাদের

আলো কখন আসে?"

"ঠিক নেই কিছু। কোনোদিন তাড়াতাড়ি, কোনোদিন দশটা-টশটারও পরে।"

বাড়ির সদরে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ল সরসী। বাইরে থেকে মনে হল, কোনো কালে রঙচঙ হয়ে থাকলেও এখন বাড়িটার গায়ে কোনো রকম রঙের চিহ্ন নেই, একেবারে কালচে দেখাচ্ছে। সদরের পাশে হাত দুই জমি চৌকো করে বাঁধানো. লতানো জুঁই উঠে গেছে দোতলায়। কালচে ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, মস্ত একটা ফাটল ধরে আছে বাড়িটার গায়ে।

সদর খুলল।

"এসো", সরসী ডাকল।

দরজার পাশে বয়সী ঝি, হাতে লণ্ঠন। যতিকিশোর ভেতরে এল।

সরসী নিজেই সদর বন্ধ করল। করে ঝিকে বলল, "দুপুরে কি মাসির আর জ্বর এসেছিল দুর্গাদি?"

দুর্গা মাথা নেড়ে বলল, না—আসে নি।

আলো দেখাচ্ছিল দুর্গা। সিঁড়িটা চওড়া নয়, ধাপগুলোও খাড়া। যতিকিশোর সাবধানে সিঁড়ি উঠতে লাগল।

দোতলার মুখে এসে আলো দেখা গেল ঘরের। ডান দিকের ঘরে টিমটিমে বাতি জ্বলছে।

সরসী দুর্গাকে বলল, "তুমি কোণের ঘরটায় আলো দাও একটা, আমরা আসছি।"

দুর্গা আলোর যোগাড় করতে চলে গেল।

সরসী বলল, "চলো, মাসির সঙ্গে দেখা করে আসবে।"

যতিকিশোর বলল, "আমাকে কি মনে আছে?"

"তা আছে", সরসী বলল, "এমনিতে চিনতে পারত না হয়ত। মাসি জানে তুমি আসবে।"

যতিকিশোর বুঝতে পারল, সরসী খবরটা আগেই দিয়ে রেখেছে। মাসির কাছে সে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, এমন কি এখনকার যতিকিশোরের অনেক কিছুই তাঁর অজানা নয়।

সরসীর সঙ্গে যতিকিশোর মায়ালতার ঘরে এল।

বিছানায় শুয়ে ছিলেন মায়ালতা। দরজার দিকেই তাঁর চোখ ছিল। বোধ হয় সরসীদেরই অপেক্ষা করছিলেন। যতিকিশোররা ঘরে আসার পর তিনি বিছানার ওপর উঠে বসলেন ব্যস্ত হয়ে।

সরসী বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হাসির গলায় বলল, "এই দেখো মাসি, কাকে এনেছি!" বলে সরসী সরাসরি বিছানায় গিয়ে বসল। তার পা খালি, চটি জোড়া ঘরের বাইরে খুলে রেখে এসেছে।

মায়ালতা যতিকিশোরকে দেখছিলেন। যতিকিশোর মায়ালতাকে। বয়েস মানুষকে কোথায় ফেলে দেয়। পুরোপুরি মনে নেই, একেবারে সঠিকভাবে সেই পুরোনো চেহারা মনে করা যাবে না, তবু যতিকিশোরের মনে হল, সেই মায়ালতা, যাঁর ছিমছাম, লম্বা, সুগঠন চেহারার জন্যে একসময়ে নানা ধরনের কীর্তি ঘটেছিল শেরপুরে, আজ সেই মহিলাকেই নিতান্ত সাধারণ দেখাচ্ছে। সরু পাড়ের থান-ধুতি পরনে, সাদা ব্লাউজ, খানিকটা ফোলা ফোলা চেহারা, চোখের কোল কুঁচকে এসেছে, পুরু গাল, কপালের অনেকটা সাদা হয়ে গেছে।

সরসী মায়ালতার হাত দেখল, কপাল দেখল। বলল, "গা ঠাণ্ডা। জ্বর নেই।" মায়ালতা যতিকিশোরকে দেখতে দেখতে কি ভাবছিলেন, চেনবার চেষ্টা করছিলেন না অন্য কিছু মনে পড়ছিল, বোঝা গেল না। হঠাৎ কি খেয়াল হতে তিনি গায়ের কাপড় গুছিয়ে মাথার দিকে সামান্য কাপড় টানলেন।

"কেমন আছ?" মায়ালতা জিজ্ঞেস করলেন।

যতিকিশোর হাসির মুখ করার চেষ্টা করল। "এক রকম। আপনি কেমন আছেন?"

"এই তো...। দেখছ।"

"জ্বর হল কেন?"

"কে জানে! অমন হয়।... তোমাদের বাড়ির সব ভাল?"

যতিকিশোর এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যে বাড়ির ভালমন্দ কিছুই বোঝা গেল না।

মায়ালতা বললেন, "মেয়ের কাছে তোমার খবর শুনি আজকাল।...মস্ত একটা ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলে। এখন বেশ ভাল আছ তো?"

যতিকিশোর সরসীর দিকে তাকাল; দু' পলক তাকিয়ে থেকে মায়ালতার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। "রয়েছি তো!" যতিকিশোর ম্লান করে হাসল।

বাঁকা হয়ে বসেছিলেন মায়ালতা, হাতে ভর দিয়ে। সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, "প্রায়ই শুনি তুমি আসবে। মেয়ে বলে। আজকেও বলে গিয়েছিল। বিশ্বাস হয় নি। ভালই করেছ এসে। আমরাও তো এখন একা একা পড়ে আছি।"

সরসী বিছানা ছেড়ে উঠল। "তুমি শোও মাসি, আমি ওকে ও-ঘরে নিয়ে যাই।"

যতিকিশোর বাইরে এল। মায়ালতা থাকেন সিঁড়ির ডান দিক ঘেঁষে, প্রায় মুখোমুখি। বাঁ দিকে সরু পথটুকুর গায়ে গায়ে আরো দুটো ঘর। সরসী যতিকিশোরকে শেষ ঘরটায় নিয়ে এল। ঘরে বাতি দিয়েছে দুর্গা। টেবিল বাতি।

ঘরের বাইরে যতিকিশোর জুতো জোড়া খুলে রাখল। পায়ে মোজা। আজকাল সে একঠেঙে বকের মতন দাঁড়িয়ে মোজা খুলতে পারে না, পেটের সেলাইয়ের জায়গায় সেই টান বাঁচাবার চেষ্টা করে।

ঘরে এসে যতিকিশোর চারপাশে তাকাল। একপাশে সরু বিছানা পাতা, ছোট টেবিল, একটা হালকা চেয়ার, অল্পস্বল্প কিছু আসবাব। জানলা খোলা, বাইরের দিকের দরজাও। দুর্গা খুলে দিয়েছে হয়ত। যতিকিশোরের মনে হল, ঘরটা সরসীর।

"তোমার ঘর?" যতিকিশোর সরসীর দিকে তাকাল।

সরসী বলল, "আমারই বলতে পার। এখন আমি পাশের ঘরটায় থাকি।"

"তবে এটা?"

"আছে। ব্যবহার হয়। কেউ এলে বসে-টসে।"

যতিকিশোর বুঝতে পারল, সরসী সত্যি কথাটা পুরোপুরি বলছে না, এড়িয়ে যাচ্ছে। এ ঘর সরসীরই। তবে এখন যতিকিশোর আসবে বলে সে কিছুটা অদলবদল করে নিয়েছে। কিন্তু, যতিকিশোর তো আজ এবং কালকের রাতটা থাকবে। তারপর? তারপর সে যে এখানে আর আসবে এবং থাকবে, সরসী কি করে তা ধরে নিল?

"আমায় একটু জল খাওয়াও," যতিকিশোর বলল।

"আনি।......চা খাবে তো?"

"চা?......ক'টা বাজল?"

সরসী দাঁড়াল না, জল আনতে গেল।

ঘরের মধ্যে যতিকিশোর কয়েক দন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এই ঘরের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই, এই বাড়ি, এখানকার গোটা এলাকা তার অচেনা। তবু অপরিচয় এবং বিস্ময়ের মধ্যে যতিকিশোর যেন অনুভব করছিল, কখনো কখনো সে কেমন আরাম অনুভব করছে। না, আরাম নয়, কিসের যেন স্বস্তি। নিজেকে যেন মানিয়ে নেওয়া যাচ্ছে।

বাইরের দরজার দিকে হেঁটে গেল যতিকিশোর। দরজাব গায়ে ব্যালকনি। একই টানা ব্যালকনি পাশের ঘর পর্যন্ত ছড়ানো। সামনে সেই পোড়ো জমি, মাঠ। বাতাস আসছে ঝড়ের মতন। আকাশভরা তারা।

সরসী সাড়া দিল।

যতিকিশোর বলল. "এখানে।"

সরসী জল এনে দিল। বলল, "বাইরে বসবে? একটা চেয়ার আছে ক্যাম্বিসের, পেতে দিই।"

জল খেয়ে নিঃশ্বাস ফেলল যতিকিশোর। "বাঃ. বেশ ঠান্ডা জল!"

"টিউবওয়েলের। আমাদের কল নেই। তোমাদের মুখে কষা লাগবে।"

যতিকিশোর হাসল। "শুধু জলের কথা বলছ তো?"

সরসী চোখের মণি ভুরুর দিকে তুলে বলল. "তুমি আরও কিছু ভাবছ বুঝি?"

কিছু বলল না যতিকিশোর। জলের ঠাণ্ডা গলা থেকে নেমে বুকের তলায় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে যেন। আরাম লাগছে।

"চেয়ারটা পেতে দি?" সরসী আবার বলল।

"তুমি বড় ব্যস্ত হচ্ছ।"

সরসী আর কথা বাড়াল না। কাচের গ্লাসটা নিয়ে চলে গেল।

যতিকিশোর বাতাসের তোড়টা বুঝতে পারল। এ প্রায় ঝোড়ো হাওয়া। অনেক দূর থেকে, গাছপালা মাটি ভেঙে ছুটে আসছে। কেউ বলতে পারে না এই দূরত্ব কতটা হবে, দু' তিন চার কি পাঁচ মাইল? নাকি আরো বেশী? দূরত্ব কোনো সময়েই সঠিক করে বোঝা যায় না অনেক কিছুরই। যেমন, যতিকিশোর বুঝতে পারছে না—তার জীবনের ঠিক কোন পর্ব থেকে তার সেই দুঃখ শুরু হয়েছিল। বাল্য থেকে, না কৈশোর থেকে, না কি যৌবন থেকে। যখনই শুরু হোক, যতিকিশোর তখন দুঃখটুঃখ অনুভব করে নি। এখনও সে পুরোপুরি বুঝতে পারছে না, দুঃখের শুরু সেই তখন, নাকি আরও পরে, আরও পরে...।

আপাতত মন প্রফুল্ল রাখার জন্যে যতিকিশোর আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল না। তা ছাড়া অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠছিল। চোখে লাগছিল।

ঘরে এসে যতিকিশোর বসল। মোজা জোড়া খুলে ফেলল আস্তে আস্তে। গায়ের জামার বোতাম আলগা করে দিল।

মায়ালতার সেই পুরোনো মুখ আবার একবার মনে করার চেষ্টা করল যতিকিশোর। অনেক মুখ আছে যা একেবারে ভুলে যাওয়া যায়: মনেও পড়ে না, সেই মুখ গোল না চৌকো না লম্বা ছিল। যেমন যতিকিশোরের মনে নেই, স্কুলের করুণা পিয়নের মুখ কেমন ছিল, তিনুর বাবার চেহারা কেমন, যে-লোকটা বারোমেসে কালীপুজো করত, কিংবা বাজারের সেই ঘুগনিঅলাব মুখ একেবারেই মনে পড়ে না তার। অথচ এই মানুষগুলো—করুণা পিয়ন, তিনুর বাবা, বাজারের ঘুগনিঅলা এরা সবাই স্মৃতির মধ্যে থেকে গেছে। অনেক সময় এই রকম হয়, যতিকিশোর দেখেছে, মুখটুখ ভুলে গিয়েও কোনো কোনো লোককে মনে করা যায়। স্কুলের করুণা পিয়নকে মনে আছে এই জন্যে যে, সে হেমবাবুর ক্লাসে বেতের বিকল্পে ম্যাপ পয়েণ্টার বয়ে আনত, তিনুর বাবাকে মনে আছে, কেননা তিনুর বাবা পাড়ার মধ্যে দানাপুরী ছাগল কেটে ছালটাল ছাড়িয়ে মাংসঅলার মতন মাংস বিলি করতে পারতেন। কাজে কাজেই, যতি-কিশোর ভেবে দেখেছে, কোনো কোনো লোক তাদের আচরণের জন্যেই দিব্যি মনে থেকে যায়। মায়ালতা অবশ্য তেমন মানুষ নন যাঁর মুখ যতিকিশোর একেবারেই ভুলে যাবে। আসলে, এত অস্পষ্ট করে মায়ালতার মুখ মনে পড়ছে

যে যতিকিশোর খুশী হচ্ছে না। সে আরও স্পষ্ট করে মনে করতে চাইছে।

সরসী চা নিয়ে এল।

যতিকিশোর বলল, "তোমার সেই লোকটাকে মনে আছে? আমাদের নীচু বাজারে যে বারোমেসে কালীপুজো করত?"

প্রথমটায় বুঝতে পারে নি সরসী; পরে বুঝল। যতিকিশোর বিছানায় বসে ছিল, সরসী মোড়ায় বসতে বসতে বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে। কেন?"

"লোকটা কেমন দেখতে ছিল?"

"কেমন আবার! লম্বা মতন, হাত দুটো ছিল বড় বড়, গলায় পইতে ঝুলত।"

"লোকটাকে আমারও মনে আছে। মুখটুখ মনে করতে পারছি না, তবে খালি গা, ইয়া একটা পইতে ঝুলছে, হেঁড়ে গলা—সেই লোকটা কালীবাড়ির দরজায় বসে থাকত এটা মনে পড়ে।"

"হঠাৎ সেই লোকটার কথা?"

যতিকিশোর এক চুমুক চা খেল। একটু পবে বলল, "এমনি। মনে পড়ল। আমাব ঠাকুমা প্রায়ই আমাকে কালীবাড়ির ফুল সিঁদুর আনতে পাঠাত। পাঁচটা দশটা পয়সা দিত ঠাকুরের থালায় দেবার জন্যে। আমি কতবার সেই পয়সা, অন্তত তার থেকে কিছুটা মেরে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু লোকটা ফুল সিঁদুর দিয়ে আমার দিকে এমন কবে তাকাত যে মনে হত, আমাব পকেটে ক' পয়সা আছে সব ও জানতে পারছে। ভয়ের চোটে পুরো পয়সাই বের করে দিতাম, মারতে পারতাম না।" যতিকিশোর হাসল।

সবসী স্বাভাবিক গলায় জোরে হেসে উঠল।

হাসি থামার পর সরসী ঠাট্টা কবে বলল, "একেবারেই চুরি করতে না, তা নয়!"

যতিকিশোর বলল, "কালীমন্দিরের পয়সা চুরি করাটা যখন রপ্ত করলাম তখন ঠাকুমা আমায় নোটিশ সার্ভ ক'ব ফেলেছে। মতিকে পাঠাত।" যতিকিশোর হাসতে লাগল।

হাসি চাপতে গিয়ে চায়ের বিষম খেল সরসী। সামলে নিল।

যতিকিশোর অন্যমনস্কভাবে আলোর দিকে তাকাল। বাতাসেব ভয়ে দুর্গা ঘরের কোণ ঘেঁষে নীচু জায়গায় আলো বেখেছে। যতিকিশোর বলল, "আমি মায়ামাসির কথা ভাবছিলাম। তখনকাব মুখটা একেবাবে অন্য রকম ছিল; তাই না? খুব পরিষ্কার মনে পড়ছে না, কিন্তু কাটাকাটা একটু লম্বা গোছের মুখ ছিল। কাজললতার মতন চোখ...।"

সরসী কিছু বলল না; যতিকিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কথাটা আর টানল না যতিকিশোর; হঠাৎ ছেড়ে দিল। দিয়ে আচমকা বলল, "তোমরা এতো জায়গা থাকতে এখানে বাড়ি করলে কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিল না সরসী; একটু পরে বলল, "বলেছি তো তোমায়' এ বাড়ি আমরা করি নি। মামা করেছিল। মামাই আমাদের দিয়ে গিয়েছে।"

যতিকিশোর পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই বার করল। এতোক্ষণ পরে তার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, "তোমার মামাকে আমি দেখি নি বোধহয়!"

"না। মামা চা বাগানে থাকত। আমরাই একবার মামার কাছে গিয়েছিলাম। চাকরি থেকে বেরিয়ে মামা প্রথমে জলপাইগুড়ির দিকে ছিল কিছুদিন, তারপর কলকাতায় এসে এখানে বাড়ি করল।"

"বিয়ে-থা করেন নি, না!"

"উঁহু।"

যতিকিশোর প্রায় উদ্দেশ্যহীনভাবে কথাগুলো জিজ্ঞেস করছিল। সরসীদের এই বাড়ির কথা সে আগেই সরসীর মুখে শুনেছে। তবু অকারণে জিজ্ঞেস করল।

চায়ের কাপ পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে সরসী গাল এবং কপালের পাশ দিয়ে একবার হাত বুলিয়ে নিল। "তুমি কি এখনই গা হাত ধুয়ে নেবে? না আলো এলে?"

"কখন আসবে আলো?"

"কি জানি! এখন ক'টা বাজল?"

"এখানে মনে হচ্ছে অনেক রাত।"

"অনেক কি করে হবে! আটটা-টাটটা হতে পারে। আজ সকাল থেকে অনেকবার আলো পাখা গিয়েছে, তাড়াতাড়ি দিতে পারে দয়া হলে। ধরো ন'টা নাগাদ।"

"আলো আসুক, দেখি", যতিকিশোর আলস্যের গলায় বলল।

সরসী হেঁট হয়ে মেঝে থেকে চায়ের কাপ দুটো তুলে নিল। বলল, "তুমি তা হলে বসো, আমি গা ধুয়ে আসি।"

যতিকিশোর দেখতে পাচ্ছিল সরসী এখনও শাড়ি জামা পালটায় নি, তার চোখমুখে সারাদিনের ময়লা, চুল এলোমেলো। শুধু, সরসীর চোখে কোথায় যেন খুশীর ছিটে পড়ে রয়েছে।

"তোমার সেই প্যাকেটটা কোথায় রাখলে?" সরসী জিজ্ঞেস করল।

যতিকিশোর ছোট দেরাজের দিকটা দেখাল।

"এত হিসেবী তুমি কি করে হলে?" সরসী ঠাট্টা করে বলল, "একটা ছোটমোট ব্যাগে করে জামাটামা আনলে পারতে। একেবারে গোনাগুনতি এনেছ, না—?"

যতিকিশোর মুখের সামনের ধোঁয়াটা সরে যেতে দিল, তারপর বলল, "একটা দিন তো! বয়ে এনে কি লাভ!"

কি যেন বলতে গিয়ে সরসী থামল, পরে বলল, "দুটো বাড়তি থাকলে ক্ষতি হত না।"

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় যতিকিশোর অত কিছু ভাবে নি। হয়ত সে একটা ছোট সুটকেস, ব্যাগ কিংবা অন্য কিছুর মধ্যে আরও দু-একটা জামা, পাজামা, প্যাণ্ট, গেঞ্জিটেঞ্জি নিয়ে নিত। কিন্তু সে প্রায় কিছুই নেয় নি। মীনা তখন ঘরে এসেছিল। এসে অকারণ টাকা পয়সার কথা বলছিল। মীনার সামনে যতিকিশোর এমন কিছু করল না যাতে তার চোখে পড়ে। বাথরুমে গিয়ে টুথব্রাশটা পকেটে ভরে নিয়েছিল। রাস্তায় মনে পড়ল, দাড়ি কামাবার কিছু আনা হয় নি। দোকান থেকে কাজ-চালানো একটা সেফটি রেজার, ব্লেড, ব্রাশট্রাশ কিনে প্যাকেটের মধ্যে ভরে নিল।

যতিকিশোর যে আজ বাড়ি ফিরছে না, কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে—মীনাকে জানিয়ে আসে নি। তাতে মীনার কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু যদি যতিকিশোর বলত, 'আমি এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি, দু-একদিন ফিরব না—' তা হলে মীনা অকারণে একটা অশান্তি করত। যতিকিশোর অশান্তি করতে চায় নি। বেরুবার সময় অশান্তি করলে হয়ত শেষ পর্যন্ত আসা হত না তার। সরসীকে আজ নিয়ে পর পর দু' শনিবার সে ভুগিয়েছে। এবার আর ভোগাবার ইচ্ছে যতিকিশোরের ছিল না। তা ছাড়া, যতিকিশোর বাড়িতে থাকলেও মীনা যা করত, সে না থাকলেও তাই করবে। স্বামী বাড়ি নেই জেনে দুর্ভাবনা করার মতন মেয়ে মীনা নয়। তার ঘুম ভালই হবে, রাত জেগে বসে থাকার কারণ ঘটবে না। বড় জোর মনে করবে, যতিকিশোর নিজের বাবা-মা'র কাছে গিয়েছে। মীনা মরে গেলেও শ্বশুরশাশুড়ীর কাছে স্বামীর খোঁজ করতে যাবে না, লোকও পাঠাবে না। আর মা-বাবার ওখানে ফোন যখন নেই সে প্রশ্ন ওঠেই না।

সরসী ঘরে ছিল না। যতিকিশোর সিগারেটের টুকরোটা কোথায় ফেলবে ঠিক করতে না পেরে জানলা দিয়ে ফেলে দিল।

গায়ের জামা খুলে বিছানার একপাশে আলগা করে রেখে দিল যতিকিশোর; না, গরম লাগছে না। প্রচুর বাতাস এ-বাড়িতে। বাইরের দরজা দিয়ে হা-হা করে ছুটে আসছে, জানলা দিয়ে দমকে দমকে আসছে; শব্দও সেই রকম, যেন ঝড় উঠেছে। এই বিশ্রী গরমের দিনে এত হাওয়া কলকাতার কাছাকাছি পাওয়া যায় জানলে বোধ হয় গড়ের মাঠ থেকেও লোক ছুটে আসত। খানিকটা আয়াসের জন্যেই যতিকিশোর বিছানায় শুয়ে পড়ল, পা মাটির দিকে রেখে, অথচ না ঝুলিয়ে; পা ঝুলিয়ে রাখলে পেটের সেলাইয়ে টান লাগতে পারে।

সরসী ঠিকই বলেছে। মশা আছে। এত বাতাস সত্ত্বেও খাটের তলা,

টেবিলের কোণ থেকে দু-চারটে মশা এসে গলার কাছে কামড়াল যতিকিশোরের। মুখের ওপর হাত নাড়ল যতিকিশোর। সরসীর এই বাড়ি তার এখন পছন্দ হয়ে আসছে। আসবার আগে, বা সরসী যখন বলত 'চলো না আমাদের ওখানে —ভাল লাগবে—' তখন যতিকিশোর এমন একটা জায়গার কথা ভাবে নি। কলকাতার আশেপাশে উঠতি শহরতলি সে দেখেছে: কাঁচা রাস্তা, নালা, ডোবা, কোনো রকমে খাড়া করা বাড়ি, বস্তি, দরমা দেওয়া দোকান—এই তো! যতিকিশোরের ধারণা ছিল, মোটামুটি ওই রকম একটা জায়গায় সরসী তাকে নিয়ে যাবে। বাড়ির ব্যাপারেও তার মনে হয়েছিল, সরসীদের বাড়ি কোনোরকমে মাথা গোঁজার মতন হতে পারে। মামার রেখে যাওয়া বাড়ি আর কতটা হবে!

এসব কারণে যে যতিকিশোর সরসীকে কথা দিয়ে, যাব যাচ্ছি করে, শেষে দু-দুটো শনিবার ভুগিয়ে তবে এসেছে তা কিন্তু নয়। আসতে সঙ্কোচ হচ্ছিল যতিকিশোরের। যদি অতীত বলে জিনিসটা একেবারে বেহায়ার মতন কিংবা অমানুষের মতন উড়িয়ে দেওয়া না যায়—তবে যতিকিশোরের পক্ষে সরসীদের বাড়িতে আসা সম্ভব নয়। তার ওপর মায়ালতা বেঁচে আছেন এখনও, এই বাড়িতেই রয়েছেন। যতিকিশোর বাস্তবিকই সঙ্কুচিত হত, লজ্জা পেত, এমন কি তার মনে হত, তার কোনো অধিকারই নেই সরসীর বাড়িতে আসার। অথচ, সরসীকে স্পষ্ট করে বলাও যেত না, যতিকিশোরের দ্বিধা ও আপত্তি কোথায়। দু-চার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায় সেই দ্বিধা জানাবার চেষ্টাও করেছে যতিকিশোর, কিন্তু সরসী গায়ে মাখে নি, তেমন গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে নি।

যাই হোক, যতিকিশোর যে শেষ পর্যন্ত সঙ্কোচ, দ্বিধা সত্ত্বেও এল বা আসতে বাধ্য হল, তার কারণ—তার পক্ষে এখানে আসা কেমন অবধারিত হয়ে উঠল। কোনো কোনো মানুষের বেলায় হয়ত এই রকম হয়, ভাগ্য—মানে ভাগ্য যদি থেকে থাকে—তবে চাকার মতন ঘুরে আসে, বা সেই মানুষটিকে পুরো এক পাক ঘুরে আবার সেখানে ফিরে আসতে হয়, যেখান থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিল।

যতিকিশোরের বেলায় পালানো কথাটা ওঠে না। সে ফেলে এসেছিল। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, ক্ষোভ দুঃখ না রেখে, সহজেই ফেলে এসেছিল। এখন, এতোকাল পরে সে-সব ফিরে আসছে, সেই পুরোনো দিন।

সরসীর গলা শোনা গেল। কথা বলছে।

যতিকিশোর দরজার দিকে তাকাল। সরসী ঘরে আসে নি। বাইরে কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। হয়ত দুর্গার সঙ্গে। গা ধোওয়া শেষ করে এল সরসী। সরসীর গলার স্বর তেমন একটা পালটায় নি। সামান্য মোটা হয়ে গেছে, কিন্তু আগের মতন সেই অল্প একটু নাকি সুর আছে, জিব খেলিয়ে

কথা বলার সেই ধরন।

অনেক বয়েস হয়ে গেল সরসীর; যতিকিশোরের বিয়াল্লিশ শেষ পার হয়ে আসছে। সরসীর হয়ত সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। ওই রকম। বছর দুই-তিনের ছোট-বড় ছিল ওরা। মায়ালতা যখন পরিপূর্ণ যুবতী, সরসী তখন কিশোরী, সে-আমলের হাঁটু-ঝুল ফ্রক পরত। মায়ালতা এখন প্রায় বৃদ্ধা, অন্তত চেহারায়, বয়েস হয়ত পঞ্চাশের কাছাকাছি।

এই মায়ালতা, যতিকিশোরের স্পষ্টই মনে আছে, শেষ বিকেলে বা সন্ধ্যের গোড়ায় নিজেদের বাড়ির জানলায় গরাদে বুক চেপে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যতীনদার টেলারিংয়ের দোকানের ছোট বেঞ্চিতে মানিকদা কাঞ্চনদাদের ভিড় বেড়ে যেত! দু-একজন কাকা মামাও যে এই সময়টাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করার জন্যে বেছে না নিতেন তাও নয়। যতিকিশোরদের এক বন্ধু, অখিল, মায়ালতাদের বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে পেচ্ছাব করত, বলত: এখানে পেচ্ছাব করতে খুব আরাম লাগে মাইরি।

সরসী পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি বলল যেন। যতিকিশোর বুঝতে পারল না।

হঠাৎ কেমন আলোর ভাব হল ভেতর বারান্দায়।

তার পরই ঘরে এসে সরসী বলল, "আলো এসেছে।" বলতে বলতে সে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল।

আচমকা বার কয়েক দপ দপ করে সাদাটে আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। এতোক্ষণ একটানা অন্ধকার, কেরোসিনের ম্যাটমেটে আলোর পর এত উজ্জ্বল, ফরসা আলো চোখে লাগায় যতিকিশোর কপালের ওপর হাত রেখে চোখ বন্ধ করল। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে থাকল, তাকাল, আবার পাতা বুজল।

শেষে চোখ খুলে যতিকিশোর বলল, "চোখে বড় লাগছে।"

সরসী টিউব লাইট নিবিয়ে অন্য আলো জ্বেলে দিল।

বিছানার ওপর উঠে বসতে বসতে যতিকিশোর দেখল, সরসী একটা ছাপা শাড়ি পরেছে, সাদার ওপর লাল হলুদের কলকা, ভেজা ঠাণ্ডা মুখের ওপর পাতলা পাউডার। সহাস্য চোখ।

যতিকিশোর সরসীকে দেখতে দেখতে কি যেন বেদনা বোধ করল।

২

পায়ের শব্দ পেয়ে যতিকিশোর ব্যালকনি থেকে ঘরে এল।

সরসীর মুখে কিছু ছিল, হয় সুপুরির কুচি না হয় এলাচ-মউরি। মুখ নড়ছিল।

যতিকিশোর হালকা স্বরে বলল, "তোমাদের এই বাড়িতে যেরকম বাতাস দেখছি এ-রকম বাতাস এক সী-বিচে পাওয়া যায়।"

সরসীর মনে হল, যতিকিশোরের গলার স্বর সামান্য ভারী শোনাচ্ছে। টিউবওয়েলের জল এতটা রাত্রে গায়ে ঢেলে এই বাতাস খেয়ে হয়ত গলাটা ভারী হয়েছে। ঘরে পাখা ছিল। সরসী বলল, "বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দি।" বলে পাখা চালিয়ে ব্যালকনির দিকের দরজা বন্ধ করে দিল।

"তোমাদের এই বাড়িটা কত দিনের?" যতিকিশোর জিজ্ঞেস করল।

"বছর পাঁচ-ছয়।" সরসী জানলার দিকের পরদা টেনে দিল। "এ বাড়ি যখন হয় তখন এদিকে ঘরবাড়ি কম ছিল।"

"তোমার মামা মারা গেছেন কবে?"

"দু' বছর।"

"তোমরা বরাবরই এ বাড়িতে?"

"না। আগে কলকাতার মধ্যে ছিলাম। মামার শরীর খারাপ হবার পর এ বাড়িতে এলাম।"

যতিকিশোর কৌতূহল বোধ করলেও আর কিছু প্রশ্ন করল না। মামার সঙ্গে সরসীদের যে ধরনের সম্পর্ক তাতে বাড়ি করার পর থেকেই তারা এখানে থাকতে পারত। থাকে নি। কেন?

"তোমার মশারি টাঙিয়ে দি?" সরসী বলল।

"দিয়ো; এখনই কি!"

"রাত হচ্ছে।"

"আমি দেরী করে শুই।...বসো না!"

সরসী বিছানার একপাশে বসল। যতিকিশোব সামান্য দাঁড়িয়ে থাকল।

অর্থহীন চোখে ঘরের চারদিকে তাকাল, একটু লম্বাটে ধরনের ঘর, চওড়া কিছু কম, সাদা দেওয়াল। একপাশে দেওয়াল-তাক, তাকের ওপর নানা ধরনের জিনিস, কোনোটা শখের, কোনোটা প্রয়োজনের। সরু ধরনের খাট, ছোট একটা টেবিল চেয়ার ছাড়াও, পুরোনো আমলের দেরাজ ছিল একপাশে। আর সেলাই কল।

যতিকিশোর চেয়ার টেনে বসল, সরসীর মুখোমুখি। কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল যতিকিশোরের। হাসল। সরসীর দিকে চোখ রেখেই হাসল।

সন্দেহের চোখে তাকাল সরসী। "হাসছ যে?"

"তুমি না একবার সেলাই মেশিনের ছুঁচ নাকে ঢুকিয়ে ফেলেছিলে?"

সরসী প্রথমটায় যেন অবাক হল। এ তার একেবারে বাল্যকালের কথা। মা সেলাই করছিল, সরসী পাশে বসে ছিল, বসে বসে তার পুতুলের জামা তৈরী করছিল বড় বড় ফোঁড় তুলে ছুঁচের। কি করে যেন একটা পুরোনো সেলাইমেশিনের ছুঁচ তার হাতে পড়েছিল। নাকে সুড়সুড়ি দিতে গিয়ে সেটা ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর হাসপাতালে ছুটোছুটি। মেয়ের যাই যাই অবস্থা। কথাটা সরসীরই ভুলে যাবার কথা, যতিকিশোর কেমন করে মনে রাখল?

সরসী অবাক হলেও না হেসে পারল না। বলল, "তোমার মনে আছে? কি করে থাকল?"

যতিকিশোর ঘাড় হেলিয়ে বলল, "আছে। তোমায় যখন সন্ধ্যেবেলায় হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হল আমরা তোমাদের বাড়ির কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলাম।"

সরসী অবিশ্বাস করল না। তখন ওই রকমই ছিল সম্পর্ক। বন্ধুর। তুই-তোকারি করে খেলা করেছে, ঝগড়া করেছে, আবাব লালাবাগানের মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়লে যতি তাকে বাঘ সিংহ হাতি দেখাতে নিয়ে গেছে।

সরসী হেসে বলল, "শর্মাডাক্তার এসে তোমার পা কেটেছিল, আমারও তা মনে আছে।"

যতিকিশোর যেন এক চমকে তার পায়ের সেই ভোগান্তির কথা মনে কবতে পারল। টানা তিন মাস বিছানায় শুয়ে। থাই অ্যাবসেস্। শর্মাডাক্তার কী ছুরিটাই চালিয়ে ছিল। সেই ঘা আর শুকোয় না। তখনকার দিনে, সেই মফস্বল বিহারের শহরে ডাক্তারীর এই রকমই হাল ছিল। আয়োডিনে ভেজানো গজ পুরে দিত ঘায়ের মধ্যে। মনে পড়ার সংগে সংগে যতিকিশোর যেন সেই জ্বালার স্মৃতিতে যন্ত্রণার মুখ করল।

তার পরই যতিকিশোর বলল, "বলো তো কোন পা?"

সরসী মনে করতে পারল না। ভাববার চেষ্টা করল, মনে পড়ল না। একবার ভাবল, বলে, ডান পা। আন্দাজে। বলল না। মাথা নাড়ল।

` যতিকিশোর কিন্তু ডান পা-টাই দেখাল। বলল, "এখনও সেই কাটাকুটির দাগ আছে।" বলে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল, একেবারে চুপচাপ, ছাদের দিকে মুখ তুলল, মুখ বিষণ্ন হল। বলল, "একটা জিনিস বড় আশ্চর্যের দেখছি। সেই কোন ছেলেবেলায় পায়ে কাটাকুটি হয়েছিল—তারপর ধরো এতোকাল কেটে গেল, বছর তিরিশ তো বটেই, তখনকার সেই দাগ তো গেলই না, উলটে আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বাড়ের সঙ্গে দাগটা আরও লম্বা হয়ে গেল। কি জানি আমার চোখের ভুল কি না, বুঝতে পারি না। কিন্তু ওইরকমই মনে হয়। বোধ হয়, এই সব দাগ এই রকমই, যত দিন যায়, বড় হওয়া পর্যন্ত, বেড়েই যায়।" যতিকিশোর থেমে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সরসী স্পষ্ট বুঝল না, অথচ অনুভব করল যতিকিশোর শুধু তাব পায়ের দাগের কথা বলছে না, আরও কিছু বলছে। কথা বলল না সরসী; নরম চোখে তাকিয়ে থাকল। যতিকিশোবকে দেখলে মনে হয়, মানুষটার চোখমুখে কেমন এক কালিমা নেমেছে। বয়েসের দিক থেকে এখনও সেটা নামার কথা নয়, চল্লিশ ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে মানুষ এ রকম ভেঙে পড়ে না। যতিকিশোর পড়েছে। হয়ত তার একটা বড় কাবণ, অনেক দিন বেচারীকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। পুরো পেটটাই খুলতে হয়েছিল, নাভির কাছ থেকে একেবারে তলা পর্যন্ত। এত বড় জখম সামলে নেওয়া ভাগ্য। ভাগ্যের জোরে ও বেঁচে উঠেছে। বাঁচার কথা নয়। মরা বাঁচার এই লড়াইয়ে শরীরের যেখানে যা ছিল সব বুঝি নিঃশেষ হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল। তবু, বেঁচে ওঠার পরও এই মানুষটিকে যতটা স্বাভাবিক দেখাব আশা করা গিয়েছিল তা আর দেখা যাচ্ছে না।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। নিখুঁত মুখ ছিল যতিকিশোরের, একটু চৌকো ধরনের মুখ, থুতনির দিকে সরু, টেপা; শক্ত চিবুক, চোয়ালের হাড় কোনোদিনই চোখে পড়ত না, খানিকটা মোটা লম্বা নাক, মাঝারী কপাল। যতিকিশোবেব এখনকার চেহারায় মুখের জীবন্ত ভাবটা মরে গেছে, ফ্যাকাশে, রোগাটে মুখ, চোয়ালের হাড় ফুটেছে, কপাছে কলসিটের দাগের মতন কোঁচকানো রেখা, চোখের উজ্জ্বলতা মাছেব আঁশের মতন সাদাটে হয়ে গেছে। গায়ের রঙ এতোটা ময়লা কোনোকালেই ছিল না, এখন রঙ ময়লা, চামড়া খসখসে হয়েছে।

সবসী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, "মাসি কি বলছিল জানো?"

"কি?" যতিকিশোর বলল।

"তোমায় আর সেই যতি মনে হয় না।"

মাথা নেড়ে কথাটা স্বীকার করে নিল যতিকিশোর। বলল, "না হবারই কথা। মাসিকেও তো মনে হয় না।"

"আহা, মাসির বয়েস হয়েছে। তা ছাড়া মাসির ওপর দিয়ে কম গেল না।"

"মাসির বেলায় ঘড়ি সামনের দিকে যায়, আমার বেলায় কি কাঁটা পেছন দিকে যাবে?" যতিকিশোর ঠাট্টা করে বলল।

"তোমার সঙ্গে মাসির তুলনা? মাসির পঞ্চাশ চলছে। আর তোমার?"

"কম কি?"

"অনেক কম। বিয়াল্লিশও হয়েছে কিনা কে জানে!"

"যদি নীলাম ডাকো আরও একটু চড়তে বলব।"

"চড়ে লাভ নেই। এমনিতে তো চড়িয়েই রেখেছ। তোমায় দেখলে এখন লোকে পঞ্চাশ-টঞ্চাশ ভাবতে পারে।"

"তা পারে", যতিকিশোর এক ধরনের হালকা বৈরাগ্যের গলায় বলল, "আয়নায় মুখ দেখলে আমারই তাই মনে হয়।...কিন্তু তুমি? তোমার ব্যাপারটা কি?"

"আমি? কেন, আমারটা খারাপ দেখলে কোথায়? কতটা মুটিয়েছি জানো?"

যতিকিশোর মজার চোখ করে হাসল। "নটুবাবুর গিন্নীর মতন।"

সরসীর যেন দু' মুহূর্ত সময় লাগল নটুবাবুর গিন্নীকে চিনতে। তারপর হেসে ফেলল, জোরেই। মাথা নেড়ে বলল, "সর্বনাশ, নটুবাবুর গিন্নী হতে বলো না। সে-বেচারীকে দেখলে টাঙাঅলার ঘোড়াগুলো পর্যন্ত সওয়ারী ফেলে পালাতে চাইত।"

যতিকিশোর হাসছিল।

সরসী অলসভাবে মাথার বিনুনিটা বুকের দিকে টেনে নিল। বলল, "নটু-কাকিমা মানুষটি বড় ভাল ছিল। আর তেমনি পয়মন্ত। নটুকাকা সামান্য একটা কাপড়ের দোকান দিয়েছিল মতি মহল্লায়, সেই লোক কত বড় মহাজন হয়ে গেল...।"

"তোমার পয়মন্তে কেউ আর মহাজন হল না! কি বল?"

"কই আর!"

দুজনের মধ্যে কেমন এক চোখাচোখি হয়ে হঠাৎ দুজনেই নীরব হয়ে গেল। স্তব্ধতার মধ্যে পরস্পর যেন কিছু একটা আদানপ্রদান করছিল, তার আগেই যতিকিশোর সতর্ক হয়ে উঠে বলল, "তোমার আমার বয়েসের তফাত কত বলো তো?"

মুখ নীচু করে ছিল সরসী; বলল "দু-এক বছর।"

"না; তিন-চার বছর..."

'দশ বছরও বলতে পার।"

"তুমিও শরীর স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলেছ।"

"মেয়েদের শরীর আর কতকাল টিকবে?"

"কতকাল হল তোমার?" যতিকিশোর পরিহাস করল।

"ওমা, বুড়ি হয়ে গেলাম না! আটত্রিশটা বছর কম হল?"

"বেশী হল না।......আমার কেন বেশী হল তা তুমি জানো না, শশি। একটু-আধটু শুনেছ, আমি বলেছি। সব কথা তুমি জানো না।"

মুখ তুলে তাকাল সরসী। কোথায় যেন কাঁপন এসে লাগল। আবেগে, না বোধে? সরসী বুঝল না, বুকের কাছটায় ফিকে ব্যথার মতন টান লাগল। অনেককাল আগে, যতিকিশোর তাকে 'শশি' বলেই ডাকত। ওটা সরসীর বাড়ির ডাকনাম। বাবার মুখে সরসী বরাবরই শশি ছিল। যতিকিশোরও বলত, শশি। কখনো কখনো। যখন সরসীর ওপর আদরে গলে যেত। আজকের বয়েসে যতিকিশোর আর আদরে গলে যাচ্ছে না; যাবার কথাও নয়। তবু শশি বলে ডাকল, আগেও দু-একবার ডেকেছে, হাসপাতালেই ডেকেছিল প্রথমদিন। সরসীরও এক-আধ সময় মনে হয়েছে, যতিকিশোরকে সে পুরোনো নাম ধরে ডাকে, যেমন আগে ডাকত—যতি বলে, কখনো কখনো শুধু 'কিশোর', কিন্তু ডাকে নি; ডাকলে ছেলেমানুষী হত। কে জানে যতিকিশোরই হয়ত হাসতে হাসতে বলত: 'আর আমায় কিশোর বলিস না শশি, বুড়ো বল, বুড়ো।'

যতিকিশোর বলল, "থাকগে, ওসব কথা বাদ দাও। তোমার বয়েস হয়েছে এটা আমার কাছে নতুন কথা নয়।" বলে থেমে গিয়ে কি মনে করে আচমকা জিজ্ঞেস করল, "মায়ামাসি আর কিছু বলছিল?"

"না, আর কি বলবে!"

সামান্য চুপ করে থেকে যতিকিশোর কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, "আমার কিন্তু লজ্জাই করছে।"

সরসী আর বসে থাকল না, উঠে দাঁড়াল। রাত হয়ে গিয়েছে অনেকটা। এ বাড়িতে আর কোনো রকম সাড়াশব্দ নেই, কোথাও আলো জ্বলছে না, সরসীর ঘরের আলোও নিবনো। বাইরেও সব অসাড়। ফাঁকা জায়গা বলে কোথাও একটা কুকুরও নেই যে আচমকা ডেকে উঠবে।

বিছানার পায়ের দিকে মশারি ছিল পাট করা। সরসী মশারি তুলে এনে লম্বা করে ঝুলিয়ে ঝেড়ে নিল। টেবিলের একপাশে রাখল। বিছানার ওপর পাতা মোটা চাদরটা সরিয়ে সমস্ত বিছানা হাত দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করল; বালিশটা গুছিয়ে রাখল।

"তোমার একটা বালিশে হয়, না দুটো বালিশ দাও মাথায়?" সরসী ঘাড় ফিরিয়ে শুধলো।

"একটাই থাক।"

"আর একটা লাগবে তো বলো, আমার ঘর থেকে এনে দি।"

"কি দরকার?"

"পেটে বালিশ লাগবে না তো?"

যতিকিশোর আজকাল পেটের কাছে নরম একটা বালিশ রেখে শুচ্ছে। পাশ ফিরে শোবার সময় বালিশটা থাকলে তার মনে হয় সেলাইয়ের জায়গাটাকে সাবধানে রাখা গেল, তাতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে, আরামও লাগে। সামান্য দ্বিধার সঙ্গে যতিকিশোর বলল, "বাড়তি থাকলে একটা দিতে পার।"

সরসী টেবিলের ওপর থেকে মশারি তুলে নিতে নিতে বলল, "তা একটু বাড়তি না রাখলে কি চলে সংসারে," বলে যেন ঠাট্টা করেই হাসল।

যতিকিশোর কথা বলল না। সরসী মশারি টাঙাতে লাগল। যতিকিশোর সরসীকে দেখছিল। মেঘলা দিনের ঘোলাটে আলোর মতন গায়ের রঙ সরসীর, না উজ্জ্বল, না কালচে, চাপা, ছেলেবেলায় আরও উজ্জ্বল ছিল। শেষ যখন যতিকিশোর দেখেছে সরসীকে, তখন সরসীর বয়স আঠারো হবে, সমস্ত শরীরে পলি পড়ার মতন কবে নরম এক লাবণ্য নামছিল, ছিপছিপে হাত পা ভরাট হয়ে আসছে, রঙ যেন চামড়ার তলা থেকে মোলায়েম এক আভা বার করে আনছিল, লম্বা ধরনের মুখ, অথচ সমস্ত কিছু পাতলা—ঠোঁট, থুতনি, কানের লতি, টিকোলো নাক, টানা টানা চোখ। এখন সরসী মাথায় একটু লম্বা হয়েছে আগের চেয়ে, চোখে সেই রকম লাগে। বয়েসের কথা ভাবলে মানুষকে মাথার দিকে অল্পসল্প চড়িয়ে দেখার ইচ্ছেটাই যেন হয়। সরসী যদি এক-আধ আঙুল বেড়ে গিয়ে থাকে মাথায়, যেতেই পারে। তবে সেই স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা তার শরীরে আর কোথাও নেই। না, সরসী মোটা হয় নি, অল্প মেদ জমেছে, পিঠ কোমর পেছন খানিকটা ভারী লাগে, মুখের আদল অত ছিমছাম নেই, সামান্য মোটা হয়ে গিয়েছে, তবু ওই মুখ কয়েকটা বরষের দাগের মতন ছিট সত্ত্বেও কিসেব গুণে যেন কোমল হয়ে আছে।

যতিকিশোর জানে, যুবতী সরসীকে সে দেখছে না। যাকে দেখছে তার এই চেহারাই এখন স্বাভাবিক। তবু আরও কিছুদিন সরসী টলটলে থাকতে পারত। নেই যে তার জন্যে যতিকিশোরের আফসোস হল না, এই মাত্র দুঃখ হল—সরসী তারই মতন পড়ন্ত দিনের ছোঁয়া পেয়ে ম্লান হয়ে আসছে।

মশারি টাঙানো শেষ করে পাশগুলো গুঁজে দিল সরসী। ওপাশের মশারির আড়াল থেকে সামনে এসে বলল, "তোমার বালিশ দিয়ে যাচ্ছি।"

যতিকিশোর উঠল না। ছোট করে হাই তুলল। সামনে পাতা বিছানা দেখেই বোধ হয় হাই উঠেছিল, বা রাত হয়ে যাওয়ায় অবসাদ আসছিল গোপনে।

সরসী ফিরে এল। এক হাতে বালিশ, কোমরের কাছে ধরা; অন্য হাতে কাচের গ্লাসে জল। জল নামাবার আগে জিজ্ঞেস করল, "খাবে?"

মাথা নাড়ল যতিকিশোর। খাবে না।

জল রেখে গ্লাসের ওপর একটা ছোট বই চাপা দিল সরসী। বালিশটা মশারির মধ্যে দিযে বিছানায় রাখল।

"আর রাত করো না, শুয়ে পড়ো," সরসী বিছানার কাছে দাঁড়িয়েই বলল; একবার মুখ তুলে মাথার ওপর পাখাটা দেখল। যেন জোরে না ধীরে চলছে দেখে নিল। তারপর চোখ নামিয়ে যতিকিশোরকে দেখতে দেখতে বলল, "শোবার সময় দরজা বন্ধ করে দিয়ো। এদিকে একটু চুরিচামারি হয়।"

যতিকিশোর হঠাৎ কেমন কৌতুক বোধ করে বলল, "আমার আর চুরি করার কি আছে?"

সরসীর চোখের দৃষ্টি যেন পলকের জন্যে উজ্জ্বল হাস্যময় হল, বলল, "চোর কি অত হিসেব করে; যা পায় তাই তার লাভ।"

যতিকিশোর আর কিছু বলল না। সরসী কাঁধের দিকের আঁচল গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল।

শোবার আগে যতিকিশোর ঘুমের বড়ি খেল। আজকাল এটা তার নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। হাসপাতালে থাকার সময়েই ধরা পড়েছিল, বড়ি খাবার অভ্যেস তার রয়েছে। বদ অভ্যেসটা ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টাও হয়েছিল শেষের দিকে, কোনো লাভ হয় নি; বরং বেরিয়ে এসে যতিকিশোর পাকাপাকিভাবে ওটা ধরে ফেলেছে। আজকাল বাড়িতে ওষুধ রাখা ছাড়াও ওয়ালেটের মধ্যে কয়েকটা ঘুমের বড়ি, মাথার যন্ত্রণার ওষুধ সে রেখে দেয়।

বিছানায় শুয়ে যতিকিশোর প্রথমটায় হাত পা ছড়িয়ে গা মন ভাসিয়ে শুয়ে থাকার চেষ্টা করল। এ রকম গাঢ় অন্ধকারে চোখ বুজে মন ভাসিয়ে শুয়ে থাকলে আরও তাড়াতাড়ি ঘুম আসার কথা। একটা বইয়ে যতিকিশোর পড়েছিল, হাত পা গায়ের মতন মন বা চিন্তাকে পুরোপুরি রিল্যাক্স করে রাখলে দ্রুত ঘুম আসে, সুনিদ্রা হয়। কাজে কাজেই কখনো কখনো এ-রকম চেষ্টা সে করে। মানে, মনকে কোন চিন্তার মধ্যে না জড়িয়ে এলোমেলো হালকা করে রাখার চেষ্টা করে। অবশ্য তা হয় না। চিন্তা জিনিসটা ধোঁয়ার মতন—ফাঁক-ফোকর পেলেই ঢুকে যায়। তবু এখন যতিকিশোর মনটাকে ভাসিয়ে রাখল, ডুবতে দিল না। অত্যন্ত তুচ্ছ ধরনের ক'টা কথা মনে করল: যেমন, অফিসের নীলাঞ্জন বর্কাসির বউ কয়েকদিন আগে নারসিং হোমে আবার একটি মেয়ে প্রসব করায় বর্কাসি বলেছিল: 'হবে না—আমি পই পই করে বউকে বলেছি সরকারী লেডিজ্ বাসে অফিসটফিস করো না, পেটের বাচ্চাটাচ্চা ভীষণ ভাবে বাইরের কনডিসানে ইন্‌ফ্লুয়েনসড্ হয়। স্পেস্যালি সরকারী বাস যখন তখন তার কাজটাই হল জব্দ করা।' বর্কাসির কথায় প্রচণ্ড হাসাহাসি হয়েছিল। তিন মেয়ে বর্কাসির, এই নিয়ে চার হল। বর্কাসি বলেছে, 'ভাই, মেয়ে হবার শোকে বউ আমার হাপুস চোখে কাঁদছে, আজ একটা পেনিসিলিন আই অয়েণ্টমেণ্ট নিয়ে যাব, চোখটা বেশ লাল হয়েছে, ইন্‌ফেকসান না হয়ে যায়।' বর্কাসি এই রকমই; ভীষণ মজাদার লোক। বর্কাসির কথা ভাবতে গিয়ে

যতিকিশোর হঠাৎ দাবার নৌকোর চালের মতন সটান মীনার কথায় চলে গেল।

মীনা এতোক্ষণ তার ঘরে শুয়ে পড়েছে। মীনা অনেকদিন ধরেই আলাদা শুচ্ছে। কিংবা যতিকিশোর নিজেই তার শোবার ঘর আলাদা করে নেওয়ায় মীনা আগের শোবার ঘরটা একলা ভোগ করছে। এতে তার সুবিধে, যতিকিশোরেরও। সারাদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ, মুখোমুখি বসা এতো কম যে, শোবার সময় এক বিছানা ভাগাভাগি করার কোনো মানে হয় না, বরং শুলেই আড়ষ্ট লাগে, কথা কাটাকাটি হয়, একজন অন্যজনের ওপর মনের রাগ বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে। ছোট থেকে বড় হয়ে ঝগড়া, একেবারে নোংরা কথাবার্তায় নেমে যেতে হয়।

যতিকিশোর আজ বাড়ি ফিরল না, কালও ফিরবে না—এটা মীনার নজরে না পড়ারই কথা। অন্তত আজ। আজ শনিবার। মীনা শনিবার সন্ধ্যের দিকে তার বাপের বাড়ি চলে যায়। কোনো কোনোদিন আরও আগে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। সিনেমা-টিনেমা ঘুরে ডোভার লেনে হাজির হয়। শনিবার মীনার বাপের বাড়িতে রই রই অবস্থা। দুর্গাপুর থেকে বাচ্চু মিত্তির আসে, টিটাগড় থেকে সান্যাল যায়—আনন্দ সান্যাল—যাকে ওরা বলে জে এস—মানে জলি সান্যাল। তা ছাড়া এক ফিল্ম ডিরেকটার—প্রভাততপন গোছের নাম যার সেই ভদ্রলোক আর মীনার দিদিটিদিও হাজির থাকে। জমজমাট হুল্লোড় চলে, কুকুরের গল্প, ঘোড়ার গল্প থেকে দার্জিলিংয়ে গিয়ে আইভিদি কি ভাবে তার কর্তাকে শায়েস্তা করেছে, জয়তী ডিভোর্সের জন্যে কোথায় কোথায় হন্যে হয়ে ঘুরছে, পনেরো বছরে পা দিয়েই লটি কী কেলেঙ্কারী করে বেড়াচ্ছে—এই সব গল্পের সঙ্গে বাচ্চু মিত্তির তার নতুন গাড়িতে কত কিলোমিটার স্পীড তুলেছে, জে এস কুকুর ব্রিডিংয়ের ওপর কোন্ বইটা লণ্ডন থেকে আনতে দিয়েছে তাব বিবরণ দেয়, পাঁচ সাত জনে বসে ফিস খেলা চলে, শেষে খাওয়াদাওয়া, এবং খাওয়াদাওয়ার পর বাচ্চুর গাড়িতে বসে কিঞ্চিৎ পান।

মীনা রাত করেই বাড়ি ফেরে শনিবার। না ফিরলেও কথা নেই। ফিরে এসে সোজা নিজের ঘরে চলে যায়। বাথরুম যাবার আগে শাড়ি জামা বদলাতে বদলাতে এখানে সেখানে দু চারটে ফোন সারে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা, একটুআধটু খোঁজ খবর নেওয়া। বাথরুম থেকে ফিরে এসে মীনা বিছানায় কিছু ওডিকোলন ছড়ায়, গায়ে বুকে মুঠো মুঠো পাউডার মাখে, ফিনফিনে জামায় ডিউডোরাণ্ট স্প্রে করে, তারপর পাখাটা একেবারে পুরো করে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে।

আজ মীনা যতিকিশোরের অনুপস্থিতি জানতে পারল না। কাল রবিবার। কাল বেলায় কিংবা দুপুরে জানতে পারে। হাজার হোক এক বাড়িতে

থাকা—মাঝারী এক ফ্ল্যাটে, সেখানে এত জায়গা নেই, ঘর নেই যে কেউ লুকিয়ে থাকলে তার অস্তিত্ব চোখে পড়বে না। যতিকিশোর নেই দেখলে মীনা ভেবে নেবে, সে মা-বাবার কাছে গিয়েছে। যেখানে মীনা কোনোদিনই পা মাড়ায় না।

মা-বাবার কথাটা যতিকিশোরের মনে পড়ল। বাবা বাড়ি করেছেন খিদিরপুরের দিকে। বেশী ভেতরে ঢুকতে হয় না, বড় রাস্তা থেকে গজ পঞ্চাশ। বাবা এখনও সুস্থ, মানে বার্ধক্যের ছোটখাট রোগ ব্যাধি বাদ দিলে মোটামুটি ভালই আছেন। মা বরং হার্টের কাঁপুনি, কোমরের ব্যথা এই সব নিয়ে জবুথবু হয়ে পড়েছে। মতি কলকাতায় ছিল, হুট করে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে দিল্লি। দিল্লি গিয়ে ফাঁপরে পড়েছে মতি। তার বউ ছেলেমেয়ে খিদিরপুরে, বউ সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে চোট পেয়েছিল, এখনও বিছানায়। বোন হাসি বাবা-মা'র কাছে। দু-দুবার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েও ভেঙে গেছে, হাসি এখন একটা মেয়ে-কলেজে সংস্কৃত পড়ায়। মোটামুটি হিসেব ধরতে তার বয়েস এখন বত্রিশ-টত্রিশ, যতিকিশোরের চেয়ে অনেকটাই ছোট, বছর দশ-এগারোর। হাসির বিয়ে ভাঙাভাঙির ব্যাপারে ঠিক যে কি ঘটেছিল যতিকিশোর জানে না। হাসির পায়ের একটু খুঁত আছে, নজর করে দেখলে বোঝা যায়, বাঁ পা সামান্য টেনে টেনে হাঁটে। হয়ত এই খুঁতের জন্যেই বিয়ে ভেঙেছে। বা হাসি নিজেই আপত্তি করেছে। যতিকিশোর বাবা মা, ভাইবোন কারও খবর তেমন একটা খুঁটিয়ে রাখে না। আসা-যাওয়াও কম। মধ্যে একেবারেই যাতায়াত ছিল না—ওই ন' মাসে ছ' মাসে এক-আধবার, পরে কখনো কখনো দু-এক মাস অন্তর একবার করে যায়। সম্পর্কটা একেবারেই আলগা, কেমন যেন সৌজন্যের মতন দাঁড়িয়ে গিয়েছে, যতিকিশোর নিজেও কোনো তৃপ্তি পায় না মা-বাবার কাছে গিয়ে, অস্বস্তি হয়, মা-বাবাও যে খুব একটা খুশী হয় তাও নয়, মতি মৌখিক একটা সম্পর্ক রেখেছে, হাসি একেবারেই পছন্দ করে না দাদাকে। তবু ছেলের জন্য মা'রই যা একটু-আধটু মায়া মমতা স্নেহ আজও থেকে গেছে। থাকা উচিত ছিল না।

যতিকিশোর তার পরিবারের আত্মীয়স্বজনকে বিন্দুমাত্র দোষ দেয় না! তার কোনো অভিযোগ নেই কারও সম্পর্কে। এই অবস্থার জন্যে মা বাবা মতি বা হাসির কোনো দায়িত্ব নেই, তাদের দায়ী করা যায় না, যতিকিশোর নিজেই একে একে সমস্ত কিছু নষ্ট করেছে। ছেলেবেলা থেকেই শুরু হয়েছিল মা-বাবা ছেলের কাছে যা যা আশা করত, যতিকিশোর তার কোনোটাই পূরণ করত না। একেবারেই নিরাশ, ক্ষুব্ধ, ব্যথিত করেছে মা-বাবাকে। আহত করেছে, লজ্জিত করেছে। পারিবারিক সম্মানকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়েছে।

হাসপাতালে থাকার সময় দু' দিন না তিন দিন বাবা দেখতে গিয়েছিলেন। মা বার চারেক। বাবার সঙ্গে, মতির সঙ্গে। আর একবার হাসির সঙ্গে। মতি

অফিস ফেরত মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে গেছে। হাসি মাত্র একদিনই গিয়েছিল।

বাবা হাসপাতালে একদিন বলেছিলেন, 'সেরে উঠে তুমি আমাদের কাছে যাবে না বোধ হয়?'

যতিকিশোর দুর্বল শরীর, হলুদ চোখ নিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে আস্তে মাথা নেড়েছিল।

'জানি তুমি যাবে না। আমিও তোমায় জোর করছি না। ...একটা কথা কি জানো, আমরা পুরোনো লোক, ঠাকুর দেবতা ভূত প্রেত কপাল নিয়তি সবই বিশ্বাস করে বসে আছি। তোমার কপালে এই ভোগ ছিল। আমি জানতাম একদিন তুমি বড় জায়গা থেকে ঘা খাবে। না খেলে এই সংসারটাই মিথ্যে হয়ে যায়।'

যতিকিশোর তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। সাদা মাথা। গোল কাচের চশমা। গলার কাছে পাঞ্জাবির বোতাম আটকানো। আচমকা তার মনে হল, বাবার কাছে আজ সে স্বীকার করে নেয়, হ্যাঁ—যতিকিশোর এতদিন ধরে এই জায়গাতেই যেন আসতে চাইছিল, যেখানে পৌঁছে আর সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে হাত তুলবে না, ইচ্ছেই করবে না হাত তোলার—যা অবধারিত তাকে মেনে নেবে।

৩

সকালে সরসী দরজা নেড়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল যতিকিশোরের।

চোখ মেলে যতিকিশোর দেখল, আলোয় ঘর ভরে যাচ্ছে, রোদ উঠে গিয়েছে বাইরে। ঘুম জড়ানো চোখে দরজা খুলে দিল যতিকিশোর।

সরসী বলল, "কোন্ সকাল থেকে উঠে বসে আছি চা নিয়ে। ভাবছি, এই উঠবে। এতো ঘুম তোমার! যাও মুখটা ধুয়ে এসো, আমি বিছানা তুলে চা করে আনছি।" বলতে বলতে সরসী গিয়ে ব্যালকনির দিকের দরজা খুলে দিল। আরও আলো এল ঘরে। রোদ এসেছে ব্যালকনির বারান্দায়। ঘরের ভেজানো জানলাটাও খুলে দিল সরসী।

যতিকিশোর টুথ ব্রাশটা তুলে নিয়ে বলল, "ক'টা বেজেছে?"

"সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে।"

"তোমাদের এখানে সকালটাও যেন তাড়াতাড়ি হয়।"

"গরমের দিনে ছ'টা সাতটা কম বেলা নয়।"

যতিকিশোর চলে গেল।

বিছানা তুলতে লাগল সরসী। মশারি খুলল। পাট করল। বিছানা ঝেড়ে-ঝুড়ে গুছিয়ে মোটা চাদরটা পেতে দেবার পর লক্ষ করল টেবিলের ওপর যতি-কিশোরের টাকা পয়সার ব্যাগটা পড়ে আছে। ব্যাগটা বিছানার তলায় মাথার দিকে রেখে চলে গেল।

যতিকিশোর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে জায়গাটা দেখছে, সরসী চা নিয়ে এসে ডাকল।

ঘরে এসে যতিকিশোর বলল, "কাল রাত্তিরে অন্ধকারে কিছু বুঝি নি এখন দেখছি—এ তো দিব্যি জায়গা।"

"চা দেখো, তাড়াতাড়িতে বোধ হয় পাতলা হয়ে গেল।"

একটা কাচের ডিশে কয়েকটা নোনতা বিস্কিট, নীল ডোরা দেওয়া ধবধবে কাপে চা।

যতিকিশোর প্রথমে চায়ে মুখ দিল। "কন্‌ডেনস্‌ড্‌ মিল্ক?"

"কি করে বুঝলে?" সরসী হাসল।

"স্বাদে।"

"দুর্গাদি এখনও ফেরে নি। বাজার করে দুধ নিয়ে ফিরবে। হরিণঘাটাব দুধ—প্রায়ই নষ্ট হয়। এক-আধটা টিনের দুধ রাখতেই হয় বাড়িতে।"

"তোমাদের এখানে হরিণঘাটাও আছে?"

"বাঃ, থাকবে না! তোমরা কি আমাদের মানুষ মনে করো না?"

যতিকিশোর হেসে উঠল। পরিচ্ছন্ন, সরল হাসি।

সরসীও হাসছিল। হাসতে হাসতে বলল, "তুমি না ছেলেবেলায় চুরি করে কন্‌ডেনস্‌ড্‌ মিল্ক খেতে?"

আপত্তি জানাতে পারল না যতিকিশোর। সত্যিই টিনের ওই দুধের ওপর তার ভীষণ লোভ ছিল। চামচেতে ঢেলে নিয়ে লুকিয়ে খেত। রুটিতে মাখিয়ে খেত। কতবার যে টিনের মুখের ডেঁয়ো পিঁপড়ে তাকে কামড়েছে। যতিকিশোর বলল, "আগেকার দুধগুলো খেতে কি ভাল ছিল, বলো!"

সরসী হাসিমুখে তাকিয়ে থাকল।

যতিকিশোর বলল, "তোমাদের বাজার কত দূর?"

"ওই একটা অসুবিধে। অনেকটা দূর। একবার এসে আবার যেতে ইচ্ছে করে না। আমার তো তাড়াতাড়ি থাকে, একবার যাব, আসব, আবার চান খাওয়া-দাওয়া করে অফিস ছুটব—হুড়োহুড়ি করে অত পারি না।"

"তুমিও বাজার যাও নাকি?"

"ছুটিছাটার দিন যাই।"

"আজ তো গেলে না?" যতিকিশোর সকৌতুক গলায় বলল।

"যাব ভেবেছিলাম। তারপর দেখলাম তুমি উঠছ না, কখন উঠবে, কে চা করে দেবে। দুর্গাদিকেই পাঠালাম।" বলে সরসী চোখের ভঙ্গিতে হাসল। "অতিথি মানুষ এসেছ, খাতিব করতে হবে না!"

বিস্কিট মুখে রেখে যতিকিশোর আর-এক চুমুক চা খেল। ঠাট্টা করে বলল, "ভালই করেছ—ঘুম থেকে উঠে তোমার মুখটা দেখা গেল।"

সরসী লজ্জা পেল না। ঠাট্টার কথায় লজ্জা পাবার বয়েস তার নেই। দ্রুভঙ্গিও করল না। সহজ গলায় বলল, "কেমন লাগল বলো?"

যতিকিশোর জব্দ হয়ে গেল। এমন জবাব সে প্রত্যাশা করে নি। অনেকটা যেন জব্দ হবার মতন মুখ করে হঠাৎ হেসে ফেলল। হাসবার সময় সহসা তার কেমন যেন অনুভূতি হল। এমন অক্লেশ, আন্তরিক, জীবন্ত হাসি সে কতকাল হাসে নি। কী ভালই লাগল হাসতে।

সরসী সকালে অনেকক্ষণ উঠেছে। রাত্রের সেই বাসি শাড়ি। মাথার চুল

আরও একটু রুক্ষ, বালিশের ঘষায় উসকোখুসকো। চোখমুখ পরিষ্কার, কোথাও ঘুমের লেশমাত্র নেই। তার কানের লতিতে ছোট ছোট ফুলের টাব, সবুজ পাথর বসানো। একেবারে ঘরোয়া করে শাড়ি পরা, খালি পা।

যতিকিশোর খুশীর চোখে সরসীকে দেখতে দেখতে বলল, "যেমন লাগস তেমন তো বলতে পারব না; তবে আজ দিনটা ভালই যাবে।"

সরসী ঠোঁট টিপে হাসল।

"মাসির খবর কি? কেমন আছেন?"

"ভাল। গা ঠাণ্ডা। .... খানিকটা আগে উঠেছে।"

চা শেষ করল যতিকিশোর। করে সিগারেটের প্যাকেট আনতে টেবিলের কাছে গেল।

"তুমি টেবিলের ওপর ব্যাগটা ফেলে রেখেছিলে। বালিশের তলায় রেখে দিয়েছি।"

"হ্যাঁ, কাল ওষুধ নিয়েছিলুম।"

"ওষুধ?"

"ঘুমের!"

"ও!" সবসী অন্যদিকে তাকাল।

সিগারেট ধরিয়ে যতিকিশোর টেবিলের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকল। "তোমাদের এখানে কাছাকাছি পান সিগারেটের দোকান নেই?"

"কেন? সিগারেট?"

"হুঁ—" যতিকিশোর গলার মধ্যে ধোঁয়া রেখে মাথা নাড়ল।

"আনতে দিয়েছি।"

ধোঁয়া গিলে ফেলল যতিকিশোর। "তোমার আতিথ্যে কোনো ত্রুটি থাকছে না, সরসী।"

এবার উঠল সরসী। তার হাতে কাজ রয়েছে। মাসির জন্যে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে; কাল থেকে উপোস দিচ্ছে মাসি। দুর্গাদি বাজার নিয়ে আসবে এখুনি। যতিকিশোরের জন্যে জলখাবার করতে হবে, আবার চা হবে।

"কাগজ এসেছে, তোমায় দিয়ে যাই, বসে বসে দেখো; আমি খানিকটা কাজকর্ম সেরে আসি", সরসী বলল।

যতিকিশোর সিগারেট খেতে খেতে আবার ব্যালকনির দিকে গেল। রোদ আসছে এবার দরজার দিকে। গরমের দিন। জ্যৈষ্ঠ-ফৈষ্ট চলছে বোধ হয়। এই সকালেই টকটক করছে রোদ, ঝাঁজ জমতে শুরু করেছে। সামনের মাঠে দু-তিনটে মোষ চরছে, একেবারে খটখটে মাঠ, কাঁচা রাস্তার খোয়া লাল হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে ডাইনে বাঁয়ে, নতুন একটা বাড়ির কাজ চলছে দূরে, ইটের স্তূপ, টিনের ছাউনি, আধ গাঁথা দেওয়ালের গায়ে ভারা বাঁধা।

"কাগজ দিয়ে গেলাম।" সরসীর গলা।

যতিকিশোর বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকল।

দূরে, উঁচু রাস্তা দিয়ে বাস আসছে যাচ্ছে। আকাশটা সাদাটে; রোদের আভা জমে একটু-বা লালচে। জুঁই গাছটার পাতাগুলো রোদে ধুলোয় খানিকটা শুকনো।

আর এই সময় আচমকা গানের সুর ভেসে এল। যতিকিশোর মাথা ঘোরাল। না, সরসী নয়। সরসী তার ঘরে রেডিয়ো খুলে দিয়ে অন্য কাজে চলে গেল বোধ হয়।

যতিকিশোর ঘরে এল।

সকালটা কাটল। বেলা হল। আরও বেলায় বোঝা গেল রোদ বড় চড়া এখানে। চারপাশ দিয়ে ঘিরে ধরেছে খরা রোদ। বাইরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিতে হল, এমন রোদে মেঝে ফেটে যায়। জানলাটাও বন্ধ করতে হবে। পূব থেকে ক্রমশই রোদ হেলে গিয়েছে।

মায়ালতা এসে বসে ছিলেন কিছুক্ষণ। সামান্য কথাবার্তা হল। সাংসারিক কথা—দাদা বাড়িটা বোন ভাগ্নীকে না দিয়ে গেলে সেই পালিত লেনে পড়ে থাকতে হত। পালিত লেনের বাড়িতে দেড়খানা ঘর ছিল একেবারে চিলে কোঠার কাছে। সরু সরু সিঁড়ি। কলতলা নীচে। জলের কষ্ট ছিল খুব। তার ওপর ওদিককার আশেপাশের পাড়া ভাল ছিল না। রোজ গণ্ডগোল লেগে থাকত। মারপিট, হই হই।

এখানে এসে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন মায়ালতারা। খানিকটা সুরাহাও হয়েছে সংসারের। নীচের তলায় এক পাঞ্জাবী ভাড়াটে আছে। পেছন দিক দিয়ে তাদের আসা-যাওয়ার পথ। মানে সদরের গায়ে আর একটা সরু ফটক আছে। পাঞ্জাবীরা লোক ভাল। স্বামী স্ত্রী আর দুটো বাচ্চা। স্বামী কাজ করেন অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরিতে, স্ত্রী যান ছোটদের কোন কন্‌ভেন্ট স্কুলে পড়াতে সকাল বেলায়। বাচ্চা দুটো হরদম ওপরে আসে। কী সুন্দর বাংলা বলে।

"সবই সুবিধের হয়েছে, অসুবিধে শুধু মেয়েটার। নাকেমুখে গুঁজে সেই দৌড়াদৌড়ি করে বেলা ন'টায় ছোটে, এতখানি পথ, বাসে বসতে জায়গা পায় না অর্ধেক দিন—আর ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যে। শরীর স্বাস্থ্য কি টেকে এতে, বলো?"

যতিকিশোর বলল, "তা ঠিক, দূর অনেকটা।...কিন্তু এখানে আরামে আছেন।"

"তা রয়েছি। অনেক শান্তিতে। ......বর্ষার ক'টা মাস মেয়েটার আরও ঝকমারি যায়। এক একদিন কাক-ভেজা হয়ে রাতে বাড়ি আসে। কত ভয়

ভাবনা হয় বলো।"

"চাকরিটা ছেড়ে দিক না," যতিকিশোর বলল মজা করেই।

"চাকরি ছাড়লে খাব কি? বাড়ি ভাড়ার টাকায় আজকালকার দিনে দু-তিনটে পেট চলে?"

যতিকিশোর মাথা নেড়ে স্বীকার করল কথাটা। অবশ্য আজকালকার দিনের সংসার চালানোর ব্যাপারে তার তেমন একটা খোঁজখবর রাখার কথা নয়। তবু এ তো সবাই জানে, সর্বদাই শোনা যায়।

মায়ালতা বললেন, "আমাদের যা হাল হচ্ছে, যতি; সাধারণ লোক আর বাঁচবে না। সেদিন একটি বউ এসেছিল এপাড়ার, বলল যে, পাঁপড়, বড়ি এ-সব তৈরী করে মুদির দোকানে বেচতে পাঠাচ্ছে। ভদ্রবাড়ির বউ, তার তো আরো দশটা কাজ আছে সংসারে— নাকি বসে বসে পাঁপর বড়ি তৈরী করবে! ......কত রকম শুনেছিলাম, আর কী হাল হল মানুষজনের, দেখছো তো! এর চেয়ে বাপু আগেই ভাল ছিলাম।"

এই ভাবেই বেলা আরও বেড়ে গেল। রোদের তাত বাঁচাতে জানলাগুলো বন্ধ করে দিল সরসী। ঘর ঝাপসা হয়ে গেল। গরমটা গুমোটের মতন জমতে লাগল। বাইরে মাটিপোড়া রোদ, মাঠঘাটের শুকনো গন্ধ উঠছিল।

সরসী মাঝে মাঝেই আসছিল। হাতের কাজ ফেলে গল্প করার অবসর যেন তার নেই। কখনো রান্নাঘরে ব্যস্ত, কখনো শাড়ি জামা কাচতে বসেছে, তার মধ্যেই ঘরদোর পরিষ্কার করল। একটা মাত্র রবিবার, সারা হপ্তার কত কাজ জমানো থাকে।

যতিকিশোর কোনো অসুবিধে বোধ করছিল না। আলস্য এবং বিশ্রামের মধ্যে সময়টা কেটে যাচ্ছিল। হালকা বই পড়ে ছিল দু-একটা, পাতা ওলটালো, সরসীদের বাড়ির ভেতরটা দেখল, ঘর দেখল সরসীর, দাড়ি কামাল সরসীর ঘরের আয়নায়।

স্নান খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে একটু তন্দ্রা মতন এসে গেল। সরসী ঘরে এসে দেখল, যতিকিশোর পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। ডাকল না। দরজাটা অল্প করে ভেজিয়ে চলে গেল।

বিকেলের মুখে সরসী ঘরে এসে দেখল, যতিকিশোর বিছানার ওপর তাস সাজিয়ে পেশেন্স খেলছে।

সরসী বলল, "ও মা, তুমি না ঘুমোচ্ছিলে?"

"কই, অত খাওয়াদাওয়ার পর একটু চোখ লেগে গিয়েছিল।"

"কখন উঠেছ?"

"অনেকক্ষণ—।"

"আমায় ডাকলে না কেন?"

"ছুটির দুপুরে আরাম করছ একটু, অকারণ কেন জ্বালাব।"

সরসী বসল। "আমি শুয়েছিলাম। ......যা গরম আজ। বড্ড গুমোট।"

"তুমি তাস খেল?"

"কোথায় আর খেলি! একটা কেনা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে যখন আর সময় কাটে না তখন মাসিকে বলি, এসো মাসি, গাধা পেটাপিটি খেলি।" হাসল সরসী।

"মাসি তোমার তাসের সঙ্গী?" যতিকিশোরও হাসল।

"দূর......মাসি আবার তাস খেলতে চায় নাকি! আমিও ওই তোমার মতন পেশেন্স খেলে সময় কাটাই।"

যতিকিশোর তাস ফেলে রেখেই একটা সিগারেট ধরাল। "জল খাওয়াও একটু।"

সরসী আবার উঠল, জল আনতে গেল।

বিছানার তাস গুছিয়ে নিল যতিকিশোর। দিনটা প্রায় ফুরিয়ে এল। বিকেল আর সন্ধ্যেটুকু মাত্র পড়ে আছে। ভীষণ অল্পই আর অবশিষ্ট আছে বলে মনে হচ্ছিল তার। কাল সকালে চলে যাবে যতিকিশোর। সরাসরি অফিসে। দিনটাকে আরও যদি মন্থর করা যেত, যদি বাড়ানো যেত কোনো রকমে, ভালই হত। সরসীর সঙ্গে যেন কত কিছু বলার থেকে যাচ্ছে, বলা হচ্ছে না, অথচ কি এত বলার আছে তাও খেয়াল করতে পারছে না সে।

জল নিয়ে এল সরসী।

যতিকিশোর জল খেল। "দরজা জানলা খুলে দেবে না?"

"আর খানিকটা পরে; বিকেল পড়ুক। এখনও বাইরে বড্ড ঝাঁজ রোদেব, আলোর দিকে তাকাতে পারবে না।"

ঘরের আলো ঝাপসা। ছায়া জড়ানো। ঘরের বাতাস গরম এবং গুমোট হয়ে গিয়েছে। যতিকিশোর কপালে এবং গলায় অল্প অল্প ঘাম অনুভব করছিল।

"বিকেলে চা খেয়ে বেড়াতে যাবে?" সরসী জিজ্ঞেস করল।

"বেড়াতে! কোথায়?"

"কোথায় আবার, এই সামনে মাঠে ঘুরে বেড়াবে। এত মোষ চরার মাঠ পড়ে আছে।"

"বাঃ, তুমি আমায় মোষের সগোত্র করে ফেলছ!" যতিকিশোর হাসল।

সরসী হাসি মুখেই জিব কাটল। বলল, "ছি ছি!"

সরসী মাথা ঘষেছে, রুক্ষ চুল ঘাড়ের ওপর ছড়ানো, মাথার দিকটা ফাঁপানো চুলে ফুলে আছে, পরনে কমলা রঙের তাঁতের শাড়ি, গায়ের জামাটা সাদা। গলায় পাতলা হার। হাতে সরু সরু বালা।

"ছুটির দিন তুমি কি করো?" যতিকিশোর অন্যমনস্কভাবে বলল।

"কি আর করব! ঘরের টুকটাক কাজকর্ম সারি, নিজের শাড়ি জামা কাচি, ইস্ত্রি করি, খাই দাই, ঘুমোই, দু একটা গল্পের বই পড়ি।" সরসী সহজ করে বলল।

"এখানে তোমার বন্ধুটন্ধু নেই?"

"বন্ধু? না।"

"একেবারে একলাই সময় কাটাও?"

"সেই রকমই। আমার অফিসের এক বন্ধু আছে—সে থাকে কাছাকাছি—কলোনিতে, মাঝে মাঝে সে বিকেলে বেড়াতে আসে।"

যতিকিশোর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

সরসী হঠাৎ বলল, "আমি মাঝে মাঝে কি ভাবি জানো, মাসির হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায়, কি করে থাকব আমি?"

"হঠাৎ কিছু হবে কেন?"

সরসী যতিকিশোরের দিকে তাকিয়ে থাকলেও অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, সামান্য যেন ভীত। মৃদুস্বরে বলল, "তা জানি না; মনে হয়। মানুষের জীবন, কে বলতে পারে কখন কি হয়!"

যতিকিশোর সরসীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা অনুভব করবার চেষ্টা করল। বোধ হয় এই ধরনের উদ্বেগ স্বাভাবিক।

আরও খানিকটা বসে থেকে সরসী উঠল। চা করতে গেল।

যতিকিশোর ঘরের দরজা জানলা খুলে দিল। বিকেল পড়ে আসছে। রোদ আর অতটা চোখে লাগার মতন নয়, তবু আচমকা তাকানো যায় না, তাত আছে এখনও. বাতাস গরম, শুকনে ধুলো ওড়ার ভাব চারপাশে, অল্প যেন ঘোলাটে দেখাচ্ছিল। সন্ধ্যের দিকে হুট করে ঝড় উঠবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। খোয়ার রাস্তায় দু-চার জন লোক দেখা যাচ্ছিল। বাসস্টপের দিকে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরে দাঁড়াতে পারল না যতিকিশোর, ঘরে ফিরে এল।

শেষ পর্যন্ত বিকেলও ফুরিয়ে গেল। মাঠের আর কোথাও রোদ নেই, শেষ বিকেলের রোদ পশ্চিম থেকে ঠিকরে উঠে গাছের মাথায় লাগছিল, দেখতে দেখতে তাও মিলিয়ে গেল, শুধু আকাশের এক প্রান্ত লাল হয়ে থাকল। সারাদিনের তপ্ত আকাশে এখন হালকা নীলের ভাব এসেছে।

সরসী খোয়ার রাস্তায় নেমেছিল। গা ধুয়েছে, শাড়ি জামা বদলেছে, পায়ে চটি। যতিকিশোর পাশে পাশে হাঁটছিল।

ফাঁকায় বেড়াতে বেড়াতে যতিকিশোর বলল, "কাল অফিস থেকে বেরিয়ে

আমার যে কি অবস্থা হবে আমিই বুঝছি।”

“কেন?”

“আজকের এই দিনটার পর কালকের সেই...”

“তুমি তো আসতেই চাইছিলে না।”

যতিকিশোর কথা না বলে হাঁটতে লাগল। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। দূরে কোনো কারখানা, সাদাটে ধোঁয়া উঠছিল, তার পেছনে সূর্য ডুবছে, শেষ বেলার পাখি নীচে নেমে এসে খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে।

“চলো একটু ঘাসে নামি,” যতিকিশোর বলল।

“ঘাস আর কোথায়, সব খড় হয়ে গিয়েছে,” সরসী হেসে বলল, “যা রোদের তেজ। বর্ষাটা আসুক তারপর ঘাস দেখবে।” বলতে বলতে সরসী রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামল। একেবারে খটখটে নয়, রোদে পোড়া পাতলা ঘাস রয়েছে।

যতিকিশোর বলল, “আমাদের সেই চাঁদমারির মাঠ মনে আছে?”

সরসী ঘাড় হেলিয়ে বলল, “সে একেবারে তেপান্তর। সে-সব তুমি এখানে কোথায় পাবে! আমাদের ওখানে রাস্তার দু' ধারে কত দেবদারু গাছ ছিল বলো তো, আর চাঁদমারির মাঠের উত্তরে পাহাড়। মাটির রঙই ছিল অন্য রকম। এখানে শুধু আসশেওড়ার জঙ্গল। এ দিকটা জলা জমিতে ভরতি ছিল, আজই এত ঘরবাড়ি।”

যতিকিশোর আলস্যের পায়ে হাঁটছিল। সূর্য ডুবে গেছে। আকাশের ফিকে নীল ছায়ার মতন কালচে হয়ে আসছিল। সেই খেপা বাতাস যেন আবার ছুটে আসতে শুরু করল। দূরের রাস্তা দিয়ে বাস যাচ্ছে—তার শব্দ কাঁপছিল, গাড়ি যাচ্ছে ঝড়ের বেগে, দেখতে দেখতে মিলিয়ে আসছে।

“ভাবছি, আবার একদিন আসব,” যতিকিশোর বলল।

সরসী মুখ ফিরিয়ে তাকাল। “একদিন কেন?”

“প্রায়ই আসতে বলছ?”

সরসী কোনো জবাব দিল না কথার।

যতিকিশোরও চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, “আমার কিন্তু খুবই অস্বস্তি লাগছিল কালকে। আজও...”

“মাসি তো তোমায় কিছু বলে নি।”

“না”; যতিকিশোর ঘাড় নাড়ল। “মায়ামাসি কিছু বলে নি। তুমি তো বলবেই না। তবু আমার খুব খারাপ লেগেছে। লজ্জা করছিল।”

সরসী যতিকিশোরের দিকে তাকাল না। সোজা মুখে হাঁটতে হাঁটতে বলল, “লজ্জা করে কি হবে! পুরোনো কথা আমরা আর মনে করে বসে নেই। যদি থাকতাম, হাসপাতালে তোমাকে দেখে আবার যেচে আমাদের কথা মনে করিয়ে দিতে যেতাম না।”

যতিকিশোর এখনও কথাটা ভাবে, ভাবে—সরসী কেমন করে তাকে চিনে নিয়ে আবার হাসপাতালের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো প্রয়োজন ছিল না সরসীর। যতিকিশোর তার কেউ নয়, কোনো সম্পর্ক নেই আত্মীয়তার, কোনোই অর্থ ছিল না দেখা করার, তবু কেন সরসী দেখা করল।

"তুমি কেন পুরোনো কথা মনে করাবে—" যতিকিশোর বলল, "আমার নিজেরই বার বার মনে পড়ে। ......আমি স্বপ্নেও ভাবি নি—"

"কে ভেবেছিল! আমি? আমিও ভাবি নি।"

সরসীও ভাবে নি যতিকিশোরকে আবার কোনো কালে সে দেখতে পাবে। অথচ দেখা হল। সরসী গিয়েছিল অফিস থেকে বিজলীদির সঙ্গে প্রমথবাবুকে দেখতে হাসপাতালে।

প্রমথবাবু, রাস্তায় ট্যাক্সির ধাক্কা খেয়ে জখম হয়েছিলেন। পায়ের দিকেই লেগেছিল। বুড়ো মানুষ—তার ওপর ডায়েবিটিসের রুগী; প্রথম দিকটায় ভয়ে ভয়ে কেটেছে। অফিসের অনেকেই দেখতে যেত; সরসীও গিয়েছিল। প্রমথবাবুর সেকসানেই সরসীর চাকরি। তা ছাড়া মানুষটি বড় ভাল; নিজের সেকসানের মেয়েদের স্নেহ মমতার চোখে দেখতেন। প্রমথদাকে দেখতে গিয়েই সরসী হঠাৎ যতিকে দেখল।

প্রমথদার বিছানার চারপাশে বেশ ভিড়: অফিসের লোক, বাড়ির লোক। সেদিন ভালই ছিলেন উনি। সরসী দু-চারটে কথা বলে ভিড় কমাবার জন্যে ওআর্ডের বাইরে করিডোরে দাঁড়িয়ে বিজলীদির অপেক্ষা করছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের ব্লকের কেবিনের জানলার গা ঘেঁষে আর-একটা বিছানায় কে যেন এসে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সরসী কিছু না বুঝেই প্রথমে অবাক, তারপর বিরক্ত হল। পরে মনে হল, হাসপাতালের রুগীর ওপর বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। আবার তাকাল। দেখল। কিছু যেন সন্দেহ হল সরসীর। দু-এক পা এগিয়ে আবার ভাল করে নজর করল। সেই যতিকিশোর নয়?

দ্বিধা, সংশয়, সন্দেহ নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সরসী। বার বার দেখল। চোখাচোখি হল। যতিকিশোরও যেন একই ধরনের সংশয় অনুভব করছিল। শেষ পর্যন্ত পারল না সরসী, হয়ত এত বেশী কৌতূহল দমন করা যায় না, কিংবা এই বিস্ময় তাকে নিস্পৃহ থাকতে দিল না। সরসী পা পা করে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। দাঁড়াল। দেখল আবার। ভেতরে যাবার সাহস হল না।

"যতি না?" অস্ফুটভাবে বলল সরসী।

"শশি!"

সরসী স্তব্ধ, নির্বাক। তার সমস্ত শরীর যেন কেমন চমকে উঠে ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল। চোখের পলক পড়ছিল না। বুকের মধ্যে এলোমেলো

ঘা পড়ছিল।

"তুমি এখানে? হাসপাতালে?" সরসী কেমন যেন বিপর্যস্ত বোধ করছিল।

যতিকিশোর মাথা নাড়ল। ম্লান মুখে হাসল।

করিডোর দিয়ে ধোপদুরস্ত মোটাসোটা চেহারার এক সিস্টার আসছিল। হাতে ট্রে। কিছু ওষুধপত্র ছিল বোধ হয় ট্রের ওপর। সরসীর দিকে তাকাচ্ছিল সিস্টার। সরসীর মনে হল, এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলার জন্যে যেন মহিলা বিরক্তি বোধ করছে।

সামান্য কয়েক পা তফাতেই দরজা। সরসী দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

যতিকিশোরের বিছানার কাছে এসে সরসী দেখল, লোহার খাটের মাথার দিকে বালিশে হেলান দিয়ে দুর্বল ভাবে সে বসে আছে, পা গুটিয়ে।

কথা বলতে খানিকটা সময় লাগল সরসীর। "কি হয়েছে তোমার?"

যতিকিশোর পেটের দিকটা দেখাল। কিছু বলল না। "তুমি কোথায় এসেছ?"

সরসী প্রমথবাবুর কথা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তোমার পেটে কি হয়েছে?"

"ছুরি খেয়েছিলাম।"

"ছুরি?"

"ভালই মেরেছিল, ওপর থেকে নীচে।" যতিকিশোর এমনভাবে বলল যেন ব্যাপারটার মধ্যে কোনো নাটকীয়তা নেই, শিহরণ বা বীভৎসতা নেই। "বসো না!"

সরসী বসল। বসার পর তার খেয়াল থাকল না বিজলীদি তার জন্যে নীচে নেমে চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। হাসপাতালের ঘণ্টা পড়ে যাবার পর সরসী উঠল। যাবার সময় বলল, "দু-একদিন পরে আমি আবার আসব।"

সেই থেকে সরসীর আসা-যাওয়া শুরু হল। হাসপাতালে গিয়েও প্রমথবাবুর বিছানার দিকে সে বড় একটা যেত না; অবশ্য বেশীদিন তাঁকে থাকতেও হয় নি; সরসী যেত যতিকিশোরের কাছে।

মাঠ দিয়ে খানিকটা হেঁটে এল যতিকিশোররা। আলো ক্রমশই কালচে হয়ে আসছে। চোখে পড়ছে না, কিন্তু কোথায় যেন এক জোড়া শালিখ ডাকল, একটা ঢিবির গায়ে কাঁটালতার ঝোপ, দু-চারটে ফুল ফুটে আছে। টানা রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে যে বাসটা চলে গেল তার শব্দ বাতাসে রিন রিন করে কেঁপে প্রতিধ্বনিত হয়ে যাচ্ছিল।

যতিকিশোর বিষণ্ণভাবে বলল, "পুরোনো কথা তোমরা তুলবে না জানি, সে শুধু আমায় লজ্জা দিতে চাও না বলে, কিন্তু একেবারে ভুলে যাবে তা কি হয়?"

সরসী মাথা ঘষেছিল বলে বিকেলে আর চুল বাঁধে নি, চুল আঁচড়ে আগায়

একটা রিবন বেঁধেছিল সাদা রঙের, কপালের পাশে কান ঢেকে রুক্ষ চুল ফেঁপে ছিল। আলগা চুল কপালে গালে এসে পড়েছে। হাতের উলটো পিঠে গাল থেকে চুল সরাতে সরাতে সরসী বলল, "এই একটা ভাবনা তোমার মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। আমি কতবার তোমায় বলব, সেই তখনকার ময়লা ঘাঁটার জন্যে আমি তোমায় বাড়িতে ডেকে আনি নি।"

যতিকিশোর যেন ক্ষুণ্ণ হল, বলল, "আমি তা বলি নি।"

"বলো নি তো বলো না আর। ওসব কথা ছেড়ে দাও।"

যতিকিশোর ছেড়ে দিল না; বলল, "তুমি তোমার দিক থেকে ব্যাপারটা দেখছ কেন, আমার দিক থেকেও দেখো। ......কাল, আজ যখনই আমি মায়ামাসির মুখোমুখি হয়ে কথা বলেছি, সব সময় আমার মনে হয়েছে, একদিন আমরা মায়ামাসির কোনো রকম মান ইজ্জত রাখি নি। তুমি তো সব জান......।"

জানে সরসী; সবই জানে। মাসিকে একলা নয়, সারা পরিবারকেই কত রকমভাবে ভুগিয়েছে ওরা। কিন্তু এখন সেই গ্লানির কথা মনে করতে তার ইচ্ছে করছিল না। যতিকিশোরের সঙ্গে দেখা হবার পর সরসী বার বার সেসব কথা ভেবেছে। এটা অস্বীকার করা মুশকিল, তার রাগ, বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ বা ঘৃণা কিছুই হয় নি; হয়েছিল। রাগ হত, ঘৃণা হত, বিতৃষ্ণাও আসত। তবু তেমন ভয়ংকরভাবে আর কিছু হত না। কথায় বলে, সময় সমস্ত শোক তাপ দুঃখ রাগ ভুলিয়ে দেয়। হয়ত তাই। সেই আঘাত এতকাল পরে অনেক ফিকে লাগত। কিংবা সরসী তার চেয়েও বেশী করে দেখত এই যতিকিশোরকে— যে-মানুষ নিজেই আজ ভয়ংকরভাবে আহত। না, শুধু শরীরে নয়, মনেও। দেখে কি সুখ হত সরসীর? তৃপ্তি পেত? ...তাও তো নয়। বরং কেমন যেন এক সহানুভূতি, বেদনা বোধ করত। আরও কি বোধ করত তাও সরসী স্পষ্ট করে বুঝত না, কিংবা বুঝতে চাইত না।

নিঃশ্বাস চেপে সরসী সহজভাবে বলল, "তুমি মেয়েদেরও হার মানালে।"

"কেন?"

"তোমায় আমি এতোদিন অনেক বুঝিয়েছি, তবু সেই এক বায়না।"

যতিকিশোর বুঝতে পারল সরসী কথাগুলো ভুলতে চাইছে না। এড়িয়ে যেতে চাইছে। চুপচাপ কয়েক পা হেঁটে এসে যতিকিশোর বলল, "তুমি একেবারে খৃশ্চানদের জাতে উঠে যাচ্ছ।"

"মানে?"

"এক গালে আঁচড় খেয়ে অন্য গাল পেতে দিচ্ছ।"

"কি সর্বনেশে কথা বলছ তুমি! এই গালটাও আঁচড়ে দেবে?"

যতিকিশোর অপ্রতিভ হল না। সে জানে সরসী এখন আর গালের ভয় করে না। যতিকিশোর নিজের হাত দুটো উঠিয়ে আঙুলের দিকে তাকাল,

বলল, "আমার নোখ ভোঁতা হয়ে গেছে।"

সরসী কিছু বলল না। যতিকিশোরের দিকে আরও একটু সরে এল, যেন বোঝাতে চাইল: আমি জানি, আমি জানি তোমার নোখ ভোঁতা, আঙুল বেঁকে গেছে, তুমি আর সেই মানুষ নও।

অন্ধকার নেমে গিয়েছিল। মাঠ থেকে রাস্তায় ওঠার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল সরসী। গরমের দিন মাঠঘাট ভাল না এ সময়, সাপখোপ থাকতে পারে। তাড়াতাড়ি পা চালাবার সময় যতিকিশোরকে টানল, বলল, 'রাস্তায় ওঠো।'

রাস্তায় এসে আচমকা ধুলোর দমকা পেল সরসীরা। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে সরসী সরাসরি ধুলোর ঝাপটা এড়াতে চাইল। যতিকিশোরও। দুজনেই এমন করে একে অন্যের দিকে মুখ ঘোরাল যে মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যাবার মতন হল।

ধুলো কেটে যাবার পর সরসী চোখ খুলে দেখল, যতিকিশোর পকেট থেকে রুমাল বার করছে।

চোখের ওপর রুমাল চেপে যতিকিশোর বলল, "চোখে কি পড়ল!"

সরসী হেসে ফেলে বলল, "বাড়িতে চলো, দেখছি। অন্ধকারে তো দেখতে পাব না।" যতিকিশোর সরসীর হাসির অর্থ বুঝল না।

৪

অফিসে যতিকিশোরের মন বসছিল না। মন না বসলে সাধারণত সে বকসিকে ডেকে পাঠায়। বকসির গুণ হল তার কোনো ভার নেই, ভড়ং নেই। মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে বলে এবং গায়ে কিছু মেদ জমিয়ে ফেলার জন্যে বকসিকে খানিকটা বয়স্ক দেখালেও আসলে সে যতিকিশোরেরই প্রায় সমবয়সী, দু-এক বছরের বড়। বকসি খুব জীবন্ত। তার প্রাণ আছে। আজও সে অনর্গল কথা বলতে ক্লান্তি বোধ করে না, একটানা হাসতে পারে, হাসাতে পারে। অথচ বকসি নির্বোধ নয়, ভাঁড় নয়, নিজের বিশেষ কিছু হল না, জুনিয়ার অফিসার হয়েই থেকে গেল এই দুঃখে সে অন্যদের খেউড় করে বেড়ায় না, নিজেকে মানিয়ে যথাসম্ভব সে খুশী থাকার চেষ্টা করে। বকসি এক সময় ভাল ছাত্র ছিল, বাবা বেঁচে থাকলে হয়ত সে বাইরে পড়তে যেত, বাবা মারা গিয়ে এবং জ্যাঠামশাই তাকে পথে বসিয়ে দেওয়ায় বেচারীর সব আশা ব্যর্থ হল। আর এই সময় বকসি ঘোরতর প্রেম করছিল। জীবনের বাইরেব দিকের সিঁড়িটা তেমন মজবুত মনে হল না তার, বরং সে, বকসির ভাষায়—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' করে একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলে প্রণতিকে বিয়ে করে ফেলল। বকসি বলে, বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ভাই, অত বাগাড়ম্বর করে লাভ কি, লাইফ সাইকেল অফ অ্যামিবার মতন আমাদেরও বাঁধা ছক, কিছুদিন লেফট পলিটিকস্, একটা প্রেম আর বিয়ে, চাকরি, তারপর ছেলেমেয়ের বিয়ে-থা দিতে দিতে কেওড়াতলা বা নিমতলা। সব কমপ্লিট।

টেলিফোনে হাত রেখে যতিকিশোর ইনটার কানেকসানে বকসিকে ডাকতে গিয়েও হাত তুলে নিল। ইচ্ছে করল না আর। কি হবে বকসিকে ডেকে? দু' পেয়ালা চা খাওয়া, দু-চারটে সিগারেট পোড়ানো, আর খানিকক্ষণ হাসি তামাশা—এর বেশী আর কি! তা ছাড়া বকসির আজকাল একটা দোষ হয়েছে। মাঝে মাঝেই যতিকিশোরকে বলছে, 'তুমি কিন্তু ভীষণ ভেঙে পড়ছ মিত্তির, স্পেশ্যালি আফটার দ্যাট ইনসিডেন্ট, তোমায় আজকাল সিক দেখায়, টানা ছুটি নিয়ে নাও কিছুদিন, কোথাও চলে যাও..'

কোনো সন্দেহ নেই যতিকিশোর ভেঙে পড়ছে। পড়ছে, না পড়েছে? পড়েছে বলাই ভাল। তবে ওই জখম হবার পর থেকে নয়, তারও আগে থেকে। ঠিক কখন থেকে তা অবশ্য বলা যাবে না, হয়ত অনেকদিন আগে থেকেই তার ভাঙন শুরু হয়েছিল, হয়ত আজ কয়েক বছরের মধ্যে শুরু হল, কে জানে কবে।

যতিকিশোর তার ঘরের চারপাশে উদাসভাবে চোখ বোলাল, যেন এই ঘরের কোথাও ভাঙার হিসেবটা লেখা আছে। না, নেই। অন্তত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। যতিকিশোরের এই ঘর ছোট, তার মস্ত টেবিল, নিজের এবং সামনের তিন-চারটে চেয়ার ছাড়া, একটা লোহার আলমারি, ছোট মতন ড্রয়ার সেলফ্, টুকিটাকি আরও কিছু কোনোরকমে জমা করা আছে। যতিকিশোরের অশেষ সৌভাগ্য তার ঘরে সে একটা বড় মতন জানলা পেয়েছে খড়খড়ি দেওয়া। কাচের শার্সিও অবশ্য আছে, বৃষ্টি-বাদলার দিন ছাড়া আর সব সময়ই সেটা গুটোনো থাকে। দরজার একটা পাল্লা অনেকদিন ধরেই আলগা হয়ে আছে। থাক, কি যায় আসে। যেমন এই ঘরের পেছন এবং বাঁ পাশের পার্টিসান প্রায় কালচে হয়ে এল, তাতেই বা কি আসছে যাচ্ছে যতিকিশোরের! কিচ্ছু না।

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসে পা টান টান করে ছড়িয়ে দিল যতিকিশোর। পা ছড়াবার সময় রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিল, পা বের করে নিল টেবিলেব তলা থেকে, নিয়ে পাশের দিকে ছড়াল, কয়ার কার্পেটের ওপর। দড়ির কার্পেটটা অবশ্য পায়ের ধুলোয় জুতোর দাগে চিট। তাতে কি?

জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল যতিকিশোর। চওড়া জানলা। নীচের অর্ধেকটা নীলচে রঙের দু' টুকরো কাপড়ের পরদায় ঢাকা, মাঝখানে সামান্য ফাঁক। পরদার ওপর দিয়ে খানিকটা শূন্য—কাচের মতন সাদাটে রঙ—তার ওপারে একটা পুরোনো অফিস বাড়ির করিডোর দেখা যাচ্ছিল। এখন পড়ন্ত দুপুর, মানে বিকেল হয়ে আসার দিকে বেলা ঢলে যাচ্ছে, যতিকিশোরের ঘরের মুখ পুবমুখো হওয়ায় এ সময় রোদ চোখে পড়ছে না, জানলার দিকে ছায়া নেমেছে। গরম যথেষ্ট, তবু বন্ধঘরে বসে থাকা অসম্ভব বলে যতিকিশোর জানলা খুলে রেখেছে, অন্য সময়ে বাইরে একটা খসের পরদা টাঙানো থাকে।

যতিকিশোর আলস্যবশে সিগারেট ধরাল। কিছুই করার নেই বলে এই ধরনের ধূমপান অনেক সময় চমৎকাব মেজাজ আনে। তেমন কোনো আলস্য আসছিল না, শুধুমাত্র সামান্য, স্নায়বিক সবলতা হয়ত বোধ করছিল। এক পট চা আনতে বলবে কিনা ভাবল যতিকিশোর। কফিও আসতে পারে। অফিসারস্ ক্যানটিন থেকে চা, কফি, কোল্ডড্রিংকস, স্ন্যাকস, সিগারেট, খাবারদাবার সবই আনানো যায়। গরমে চা কফি কোনোটাই আর আনাতে ইচ্ছে করল না। দু'বার চা কফি হয়ে গিয়েছে, আর ভাল লাগছে না।

টেলিফোনটাই তুলে নিল যতিকিশোর। "পালকে দিন।"

পালের সঙ্গে লাইনে যোগাযোগ হলে যতিকিশোর বলল, "পাল, আজ তোমার কাগজপত্র দিতে পারছি না।"

পাল বরাবরের মতন বলল, "দিল্লির চিঠি দুটো আজ ডেসপ্যাচে দিতে পারলে ভাল হত, স্যার।"

"কালকে দিও; আর্লি আওয়ারসে ছেড়ে দেব।"

"তাই দেবেন।...আপনি কেমিক্যালস্ ইণ্ডিয়ার চিঠিটা একটু ভাল করে দেখবেন, স্যার। মাথুর সাহেব তেমন ফেভার করতে চাইছেন না। মানে, এক্সপোর্ট লাইসেন্সে..."

যতিকিশোর কানের কাছ থেকে ফোন সরিয়ে নিতে নিতে বলল, "জানি।"

কিছু কিছু লোক থাকে যারা অফিসকে পিতার চেয়েও মান্য করে। পাল সেই জাতের লোক। বিশ্বস্ত স্বামীর মতন সে তার চাকরিটাকে স্ত্রীজ্ঞানে আঁকড়ে আছে। পাল ব্রিলিয়াণ্ট নয়, তার ধার নেই; কিন্তু অধ্যবসায় তাকে পুরস্কৃত করেছে। তা করুক। কি আসে যায় যতিকিশোরের। লোকটা বড় বেশী কথা বলে, অকারণে জ্ঞান দেয়, মানে দেবার চেষ্টা করে—যতিকিশোরের সেখানেই আপত্তি।

ফোন রেখে দিল যতিকিশোর। ওয়ারেন অ্যাণ্ড কুপারস্ দুটো চিঠি চব্বিশ ঘণ্টা পরে পাঠালেও তার সর্বনাশ হবার কোনো কারণ নেই। পাল যতই ঘোড়ায় জিন দেবার ভাব দেখাক, এই বিজনেস হাউস, যার জন্ম আঠারোশো নব্বুই সালে, কিংবা কিছু পরেও হতে পারে, আজ সত্তর আশি বছর ধরে কলকাতার বুকের ওপর বসে দামামা বাজাচ্ছে—তার অত ছটফটে হবার দরকার করে না। অবশ্য পাল যা করছে এক সময় যতিকিশোরকেও তাই করতে হয়েছিল। তবে পালের চেয়ে কম। যতিকিশোর করেছিল মীনার বাবাকে পটাবার জন্যে। একেবারে ষোলো আনা পটাবার জন্যেও নয়, নিজের কেরিয়ারের জন্যেও।

যতিকিশোরের হঠাৎ মনে হল: আচ্ছা, মীনাকে একটা ফোন করলে কেমন হয়। আশা করা যায়, মীনা এখন বাড়িতে। এই গরম আর হলকানির মধ্যে মীনা সহজে বাইরে বেরুতে চাইবে না। তার গায়ের চামড়া তাতে পুড়বে, হুট করে দু-দশটা ঘামাচি বেরিয়ে যাবে—মীনা তা হতে দেবে না। তবে দত্তমজুমদার, মানে সেই ধেড়ে কার্তিক, যে আজকাল চৌরঙ্গি পাড়ায় ট্রাভেল এজেন্সির অফিস খুলেছে, সেখানে দত্তমজুমদারের খাস কামরায় ঠাণ্ডা ঘরে মীনাকে পাওয়া যেতেও পারে। বসে বসে হয়ত ঠাণ্ডা পানীয় সেবন করছে, বা আইসক্রিম। মীনা সম্ভবত দত্তমজুমদারকে কোনো আশ্বাস দিয়েছে। কিংবা দত্তমজুমদার মীনার কানে মন্ত্র দিচ্ছে। দিক্ গে। যতিকিশোরের কিছু আসে যায় না।

দু'দিন যতিকিশোর বাড়িছাড়া। ফোন করে দেখা যেতে পারে, মীনা যতিকিশোরের গরহাজির জানতে পেরেছে কি না? ফোন করে মীনাকে বলা

যেতে পারে...

কিছুই বলা যেতে পারে না। মাথা নাড়ল যতিকিশোর, কিছুই বলা যাবে না। বছর সাত-আট আগে হলে যতিকিশোর ফোন তুলে অনায়াসে ঘোড়ার খুরের সাবলীল ধ্বনির মতন কথা বলে যেতে পারত।

সিগারেট অ্যাসট্রের মধ্যে ফেলে দিল যতিকিশোর। দিয়ে ক্লান্তির মতন করে হাই তুলল। নিঃশ্বাস ফেলল। তার টেবিলের ড্রয়ারে দু-একটা ওষুধ আছে যাতে মনটা বেশ ঝিম মেরে যায়। অর্থাৎ খাওয়ার পর আস্তে আস্তে একটা নির্ভার অবস্থা আসে, মাথার যন্ত্রণা কমে যায়, চোখ দুটো ঈষৎ ছলছলে হয়ে ওঠে, শোক দুঃখ খুশী আনন্দ কোনোটাই মগজে ঘা দেয় না, নিস্পৃহ হয়ে থাকা যায়। একবার এই ধরনের দুটো বড়ি খেয়ে যতিকিশোর অফিসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাশের ঘর থেকে খান্না এসে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

যতিকিশোর তার অবসাদ অনুভব করে আচমকা স্থির করে ফেলল কফি খাবে। একটা ঠান্ডা কালো কফি খেলে মন্দ হয় না।

বেয়ারা এলে যতিকিশোর কফির কথা বলল।

এখন সরসী কি করছে? টেবিলের ওপর ঘাড় নামিয়ে কাজ করছে? নাকি, সেও উদাসভাবে এই মরা দুপুর দেখছে?

সরসীকে একটা ফোন করা যেতে পারে। তার অফিসের নাম, ঠিকানা, ফোন সবই জানা আছে যতিকিশোরের। ফোন কবলে সরসীকে পাওয়া যাবে, সরসী ফোন ধরে সাড়া দেবে, কিন্তু যতিকিশোরের গলা শুনলে আজ নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে। বেলা দশটা নাগাদ দুজনে ছাড়াছাড়ি হবার পর আবার তিনটে নাগাদ ফোন তাকে না হাসিয়ে পারবে না।

'কি হল আবার?'

'না, কিছু হয় নি।...আমি সেই প্যাকেটটা শেষ পর্যন্ত ভুলেই ফেলে এলাম তোমাদের ওখানে।'

'তুমিই তো বললে, অফিসে ওসব হাতে করে আনা যায় না।'

'তা ঠিক।'

'ওগুলো থাক। তোমায় ভাবতে হবে না।'

সরসী খুকি নয়, কাজে কাজেই ফোন তুলে এসব অছিলায় কথা বলার অর্থ সে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারবে।

কিন্তু যতিকিশোর যে একেবারে এলোমেলো হয়ে গেছে, তার কিছু ভাল লাগছে না, কোথাও মন বসছে না, নিজেকে অত্যন্ত ভারী লাগছে। হাজার হাজার টাকার লেনদেনের চিঠিপত্রের মধ্যেও দু' দণ্ড মন বসাতে পারছে না, এটা তো সত্যি। তার মানে এই নয় যে যতিকিশোর সরসীর ধ্যান করছে। ধ্যান করার বয়েস সে কবে পেরিয়ে এসেছে, এখন সে আকুলতা আবেগ তার নেই। তা

ছাড়া সরসীকে সে কবেই বা ধ্যান করল! যখন ধ্যানের বয়েস হয়ে এসেছিল তখন সরসীর বাড়ির সামনে এক জোড়া হিজড়েকে ভাড়া করে সে নাচিয়ে ছিল। পল্টন পার্টির সেই জঘন্য বাজনা, ব্যাগ পাইপের পোঁপোঁ আর হরিয়া বাজারের জোড়া হিজড়ের নাচ। কার সাধ্য দরজা জানলা খুলে রাখে। সরসীরা বাড়ির সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে ছিল।

সেদিনকার সেই উল্লাস আজ যতিকিশোরকে অন্যভাবে মারছে। পল্টন পার্টির কারুর মুখ মনে পড়ছে না, শুধু মনে পড়ছে লাল জামা, বুকের কাছে কালো পট্টি, আর ব্যাগ পাইপের সেই বিকৃত শব্দ যেন মাথার মধ্যে কোথাও বেজে যাচ্ছে।

যতিকিশোর চোখ বন্ধ করে কপালে হাত রাখল। জীবনের চারপাশে কেউ চুনের দাগ দিয়ে পাক দিয়ে রাখে নি। এটা আটশো আশি গজের দৌড় নয় যে দৌড় শুরু করে আবার পুরোনো জায়গা দিয়ে ছুটে যেতে হবে। তবু কী আশ্চর্য, এই রকমই হয়, আবার আসতে হয়। যতিকিশোর চমৎকারভাবে দেখতে পাচ্ছে তার পায়ের তলার সেই পুরোনো চুনের দাগ।

টেলিফোন বেজে উঠল। প্রথমটায় ধরল না যতিকিশোর, পরে ধরল।

"মুখার্জি বলছি।...আপনি কি ব্যস্ত?"

"না।...আমার শরীর ভাল নেই।"

"মিস্টার লাল এসেছেন। উনি বলছেন নেক্সট শিপিংয়ে..."

"আপনি কথা বলুন। আমার কাছে পাঠাবার দরকার নেই।...ইউ মে টক্ টু সিন্‌হা। সিন্‌হা ভাল বুঝবে।"

মুখার্জি সামান্য অপেক্ষা করে বলল, "কি হয়েছে? জ্বরজ্বালা?"

"মনে হচ্ছে ওইরকম।" যতিকিশোর ফোন রেখে দিল। তার গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি, বিরক্তির ভাবটা অবিকল তার মর্যাদার মতন হল। পালকে যখন ডেকেছিল যতিকিশোর—তখন মেজাজ নরম রেখেছিল। এখন আর রাখা যাচ্ছে না। তার ভাল লাগছে না। কেন এরা অকারণ তাকে বিরক্ত করে? যতিকিশোর কি সবজান্তা? এতকাল কাজ করেও নিজের বুদ্ধি খাটাতে পার না?

কফি এসেছিল। ট্রে থেকে কফি নামিয়ে রেখে বেয়ারা চলে গেল।

যতিকিশোর কফির রঙটা দেখল। কালো। ঠাণ্ডা কফির ভক্ত নয় সে, তবু মাঝে মাঝে খায়।

জানলার দিকে বেলা পড়ে আসার আরও দু-একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। বিঘতখানেক চওড়া, লম্বা গোছের ছায়া ঘরে এসে পড়েছে। গুটোনো ঘাসের ছায়া হয়ত, অথবা জানলার বাইরে কাঠের যে শেড আছে তার ছায়া। এ সময় এক জোড়া পায়রা কোথা থেকে উড়ে এসে ছাদের আলসেয় বসে। মনে হল তারাও

এসে গেছে।

কিছু খেয়াল না করে যতিকিশোর আবার একটা সিগারেট ধরাল। একবার একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার, শখ ক'রে নৌকো চড়েছিল গঙ্গায়, নৌকোটা ঘাটে লাগবার আগে যতিকিশোর দাঁড়িয়ে পড়েছিল, হঠাৎ তার খেয়াল হল, পা দুটো এমনভাবে নৌকোর ওপর টাল খেয়ে দুলছে যে সে তার ভারসাম্য রাখার সমস্ত বোধ ও কৌশলই হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল, মাটিতে পা রাখলেও সে আর হাঁটতে পারবে না। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল যতিকিশোর।

এখন যে অবিকল তেমন লাগছিল তা নয়, তবু অদ্ভুত এক টলে পড়াব ভাব লেগেছে—যেন যতিকিশোর বুঝতে পারছে না কোথায় পা রাখবে, বর্তমানে, না অতীতে? নৌকোর তলায় যেমন জলের ঢেউ—তার মনের তলায়ও সেই রকম কি এক হাহাকার ঘা দিচ্ছিল।

সরসী হাসপাতালে এসে তাকে চিনতে পারার আগে থেকে, অনেক আগে থেকেই যতিকিশোর অনুভব করছিল তার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে এক শূন্যতা এসে গেছে। তলা থেকে ওপর পর্যন্ত। এর কোনো তুলনা দেওয়া যায় না। একটা চলনসই তুলনা দেওয়া যেতে পারে অন্য ভাবে। যতিকিশোররা যেখানকার মানুষ, এক সময়ে যেখানে ছিল, সেখানে কুয়া শুকিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। প্রথমে জল কমত, ওপরের দিকটা শুকোতো, তারপর প্রতি বছর খানিকটা করে শুকোতে শুকোতে শেষে কুয়া একেবারে খটখটে হয়ে যেত। জলের ধারা আর কোথাও কোনো অন্ধকার দিয়েই বয়ে আসত না। ফাঁকা, অন্ধকার, শুকনো সেইসব কুয়ার মধ্যে তাকালে ছেলেবেলায় গা ছমছম করে উঠত, মনে হত, পাতাল পড়ে আছে নীচে।

যতিকিশোরেরও এই রকম মনে হতে শুরু হয়েছিল: বাঁধানো কুয়ার মতন তার জীবনটা বাইরে পড়ে আছে, ভেতরে একেবারে ফাঁকা, শূন্য, বিশাল অন্ধকার। এই অন্ধকার শুধু অনুভব করা যায়, শূন্যতা দুঃসহ লাগে।

সরসী হাসপাতালে আসার পর যতিকিশোর আরও উদ্‌ভ্রান্ত, আরও যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে উঠল। কেননা সবসী আসার সঙ্গে সঙ্গে যতিকিশোর তার অতীতকে খণ্ডে খণ্ডে, পর্বে পর্বে দেখতে পাচ্ছিল।

না, সরসী প্রতিশোধ নিতে আসে নি। যতিকিশোরকে কুয়ার তলায় মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে মুখে থুতু দিতে বা লাথি মারতেও আসে নি। সে এসেছিল আকস্মিকভাবে, অযাচিতভাবে। যদি সরসী তাকে চিনেও না চিনত, অবজ্ঞা কিংবা উপেক্ষা করে চলে যেত, যতিকিশোরের কিছু বলার থাকত না। বোধ হয় সেটাই স্বাভাবিক ছিল। সরসীর কাছে পুরোপুরি উপেক্ষাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সরসী উপেক্ষা করল না। হাসপাতালে তার যাতায়াত

নিয়মিত হয়ে উঠল, সপ্তাহে দু-তিন দিনই আসতে লাগল। অফিস ছুটির আগেই বেরিয়ে পড়ত সরসী, সরাসরি চলে আসত হাসপাতালে। বসত, কথা বলত, গল্প করত। মীনার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হয় নি সরসীর। মীনা হাসপাতাল অপছন্দ করে, বিশেষ করে এই ওয়ার্ড—এই কাটাকুটির ওয়ার্ড—যেখানে নানা ধরনের রুগী, কেউ মরছে, কেউ পার্টিসানের ঘেরার আড়ালে অক্সিজেন সিলিন্ডার নাকে দিয়ে নাড়ির শেষ কম্পনটুকু জিইয়ে রেখেছে, কেউ বা বোতলের রক্ত নিতে নিতে নিঃঝুম হয়ে পড়ে আছে...না, এসব চোখে দেখা মীনার পক্ষে অসম্ভব। এক কি দু' দিন অল্প সময়ের জন্যে এসেছিল মীনা, তারপর আর নয়। যতিকিশোরও লোক মারফত নিষেধ করে দিয়েছিল মীনাকে। বাবা মা'র সঙ্গেও সরসীর দেখা হয় নি। মা'র সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এই ভয়ে সরসী একদিন করিডোরে দাঁড়িয়ে শেষে ফেরত চলে গেছে। মতির সঙ্গে দেখা অবশ্য হয়েছিল, মতি চিনতে পারে নি, সরসী পরে চিনেছিল। কথাও হয়েছে। তবে সরসী বলে নি যে সে যতিকিশোরকে দেখতে আসে।

মোটামুটি কথাটা এই, হাসপাতালে সরসী যেভাবে এসেছে, বসেছে, সঙ্গ দিয়েছে যতিকিশোরকে, অন্য কেউ দেয় নি। যতিকিশোর নিজেও চাইত না, তার চারপাশে মা বাবা ভাইবোন ইত্যাদির আরও ভিড় হোক। অফিসের যারা আসত তারা বিপদ কেটে যাবার পর আর বড় ও-মুখো হত না।

হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর যতিকিশোর কিছুদিন বাড়ির বাইরে বেরুতে পারে নি। সরসী ফোনে যোগাযোগ রেখেছিল। যতিকিশোর আবার যখন অফিস যাওয়া শুরু করল, সরসীর আর কোন অসুবিধে থাকল না। কোনোদিন ডালহাউসি পাড়ার, কোনোদিন চৌরঙ্গি এলাকার রেস্টুরেন্টে দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল। এক একদিন দুজনে, হাতে সময় পেলে, আউটরামের দিকে গিয়েও সামান্য বেড়াত।

দুজনের এই দেখাসাক্ষাতের মধ্যে থেকে নতুন করে যে দুটি মানুষ জেগে উঠল তারা যে পরস্পরকে বন্ধুর মতন গ্রহণ করছে, একজন অন্যজনের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি বোধ করছে, সেটা না বোঝার কথা নয়। সরসী নিজের সম্পর্কে মোটামুটি সবই বলেছিল, গত বিশ বাইশটা বছরের মধ্যে তার জীবনের অনেক কিছুই ওলোট-পালোট হয়ে গেছে: মা মারা যাবার আগেই তারা ভবঘুরে হয়ে পড়ল, বাবা আশ্চর্যভাবে সাসারাম স্টেশনে খুন হল, ছোট ভাইটা গিয়েছিল মামার কাছে, সেখানে তাকে কালাজ্বরে ধরল, ভুগতে ভুগতে এক থেকে আরেক, তারপর চা বাগানেই মারা গেল। মাসিই তখন একমাত্র অবলম্বন। মেসোমশাই কলকাতায়। তাঁর কাছেই আশ্রয় নিল। তারপরও নানা ঘটনা। শেষবেশ চাকরি আর মাসি এই নিয়েই দিন কাটছিল সরসীর। মামা মারা যাবার আগে তাদের নিয়ে এল নিজের কাছে।

যতিকিশোরের নিজের জীবনটা সরসীর মতন পায়ে পায়ে ভাগ্যের মার খাওয়া নয়। সে খুব তেজীভাবে ছুটতে শুরু করেছিল কৈশোর থেকেই, যৌবনে সে দুরন্ত। রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়ার মতন যতিকিশোর চারপাশে ছুটে বেড়িয়েছে, জয় করেছে, বশ করেছে, প্রয়োজন হলে নিষ্ঠুর ও নির্মম হতেও তার কোথাও বাধে নি। নিজের সাফল্য যতিকিশোরকে যতই চমৎকৃত করেছে সে আরও দুঃসাহসী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, আরও বড় করে হাত বাড়িয়েছে এবং ভাগ্যের কৃপায় বা নিজের পৌরুষের জোরে পেয়েও গেছে। মীনাকে এইভাবেই পেয়েছিল, নয়ত মীনা তার জন্যে নয়। যাই হোক, মীনা যতিকিশোরের জীবনে একটা বড় উপাখ্যান নয়, হয়ত ছোটও নয়, আর শুধুমাত্র ওই কারণেই যতিকিশোর হঠাৎ একদিন অনুভব করল না যে, সে শুকনো ইঁদারার মতন ফাঁকা জলহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। সে পরিত্যক্ত এবং একেবারেই শূন্য—এই বোধ যখন থেকে তাকে আচ্ছন্ন করল যতিকিশোর তখন থেকেই বিষণ্ন, বেদনার্ত, কাতর।

বিকেল হয়ে গিয়েছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে যতিকিশোর দেখল চৌধুরী গাড়ির দরজা খুলে ঘোষকে তুলে নিচ্ছে।

যতিকিশোর কি মনে করে এগিয়ে গেল। "চৌধুরী, আমার একটা জায়গা হবে নাকি!"

মুখ ফিরিয়ে যতিকিশোরকে দেখেই চৌধুরী সদাব্যস্ত। "আরে, যতিদা আসুন আসুন।"

যতিকিশোর পেছনের দিকে উঠল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চৌধুরী বলল, "আপনি সোজা বাড়ি যাবেন তো?"

"হ্যাঁ। তোমরা কোথায় যাবে?"

"আমরা যাব লেক গার্ডেনসে। সেখানে একটা ভাল জমি রি-সেল হচ্ছে। ঘোষের জানাশোনা লোক। কথাবার্তা বলার চেষ্টা করছি।"

যতিকিশোর দেখল ঘোষ ঘাড় ফিরিয়ে তাকে সিগারেট দিচ্ছে। নিল যতিকিশোর। "বাড়ি করার ইচ্ছে?" হালকা করে যতিকিশোর বলল।

"আমার নিজের খুব একটা ইচ্ছে নেই," চৌধুরী বলল, "কিন্তু বাড়িতে মা আর দাদা বাড়ি বাড়ি করে মাথা খারাপ করে ফেলছে। তার ওপর ছোট ভাইটা এবার ফিরবে—বার বার লিখছে। ও ফিরে এলে বিয়ে-থাও দিতে হবে। . ব্যাপারটা কি জানেন, আমরা বাঙাল মানুষ। সেই ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি. এখনও ঠিক ধাক্কাটা সামলাতে পারছি না। একটা বাড়িফাড়ি করতে পারলে তবু মনে হবে ভিতটা তৈরী করেছি।"

চৌধুরী বড় ভাল ছেলে। অ্যাকাউণ্টসে রয়েছে। কোয়ালিফায়েড। ঘোষ লিগ্যাল সেকসানের চার্জে। ধুরন্ধর।

ভিড়ের মধ্যে চৌধুরী তার পুরোনো অস্টিন গাড়িটাকে গরুমোষের মতন তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, লোকজন গাড়ি রাজ্যের ময়লা ধুলো গুমোট সবই যেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

অনেকক্ষণ পরে স্ট্র্যান্ড রোডের কিছু ফাঁকা জায়গায় গাড়ি এনে হাঁপ ফেলল চৌধুরী। বলল, "এ আর পারা যায় না, যতিদা। রোজ যে কতটা রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে কে জানে!"

"তোমার গাড়ি কিন্তু এখনও ফেইথ্‌ফুল..." যতিকিশোর হাসল।

"ওই মায়ায় ছাড়তে পারি না।.. তা আপনি সেই যে গাড়ি বেচে দিলেন, আর কিনবেন না?"

"না।"

"আসা যাওয়ার এই কষ্ট..."

"তেমন হয় না। আসবার সময় বেশীর ভাগ দিন লিফট পেয়ে যাই, না হলে ট্যাক্সি ধরি। ফেরার সময় আমার তাড়া থাকে না।"

ঘোষ ঘাড় ফিরিয়ে বলল, "বাড়িটাড়িও করবেন না?"

মাথা নাড়ল যতিকিশোর। না।

চৌধুরী আউটরামের দিকে এগুতে লাগল, বলল, "যতিদা. আপনার সেই ভিগার, ব্রাইটনেস একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি কি এখনও শরীরটা সারিয়ে তুলতে পারলেন না?"

যতিকিশোর অস্পষ্ট করে বলল, "বোধ হয় পারলাম না।"

বাড়িতে সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল মীনার সঙ্গে। মীনা বেরিয়ে যাচ্ছিল। তখনও সিঁড়ির আলো জ্বালা হয় নি, নীচের ফ্ল্যাটের নায়ারের মেয়ে আয়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, ঝাপসা আলোয় সিঁড়ির ধাপ কালচে দেখাচ্ছিল।

মীনা দাঁড়াল। যতিকিশোরও।

দুজনে চোখাচোখি হল। মীনাকে দোকানের শো-কেশের পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল. ভয়ংকর নীল রঙের শাড়ি, আঁচলায় হালকা বেগুনী লালের কাজ। নীল রঙটা ঝপসায় কালচে দেখাচ্ছে, একেবারে জাত সিল্ক শাড়িটা, হাতাহীন জামাটা অর্ধেক কাঁধ থেকে আঁট হয়ে নেমে এসেছে। মীনা, খুবই আশ্চর্য, তার শাড়ির ঢালাও আঁচল পিঠের দিকে লুটিয়ে দিয়েছে। হাতে গাঢ় নীল রঙের ব্যাগ। মাথায় বিশাল খোঁপা, যেন ঘট বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চোখমুখ ভয়ংকর ফরসা এবং মোমমাখানো মনে হচ্ছিল। হাতে জড়োয়ার বাউটি, গলায় সেটিংয়ের হার। প্রসাধনের গন্ধে বাতাস ভরে যাচ্ছে।

"কাল ও-বাড়িতে ছিলে?" মীনা সামান্য ভুরু তুলে বলল।

যতিকিশোর হ্যাঁ বা না বলল না, শুধু মাথাটা সামান্য নাড়ল।

"যাক, মা-বাবার বাধ্য হয়ে উঠছ..." চাপা শ্লেষ গলার স্বরে।

যতিকিশোর নীরব।

মীনা নীচের সিঁড়িতে পা দেবার মতন করে সামনে ঝুঁকল। "রুমকির আজ পাকা দেখা; আমি চললাম।"

মীনা সিঁড়িতে নামতে গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে বলল, "টুটুদি, অশোক, বড়দি-টড়দি সব দার্জিলিং যাচ্ছে, আসছে হপ্তায়। আজ ডেট ফিক্স হবে। আমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছি।"

যতিকিশোর উচ্চবাচ্য করল না। মীনা দার্জিলিং যাবে বেড়াতে তাতে তার মতামতের কোনো প্রয়োজন নেই।

সিঁড়িতে শব্দ রেখে মীনা চলে গেল।

যতিকিশোর ধীরে ধীরে বাকি ক'টা ধাপ উঠে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

মীনা বাড়িতে নেই, এটা যেন আরও ভাল হল। অবশ্য সন্ধ্যের সময়টা মীনার বাড়িতে থাকার কথা নয়। তবু যদি থেকে যেত, যতিকিশোর যা চাইছে —একেবারে নিস্তব্ধতা, পরিপূর্ণ একা থাকার স্বস্তি, তা জুটত না। রিনকি না রুমকি কি যেন নাম বলল মীনা—যতিকিশোর মনে করতে পারল না। কে রুমকি? মীনার সেই জাহাজী কাকার মেয়ে, না ফার্ণ রোডে যে ঘোড়েল মামা থাকে মীনার, তার মেয়ে? কে জানে!

মীনার একটা মস্ত গুণ সে বাপের বাড়ি থেকে পারুল নাম্নী এক প্রবীণাকে বাড়িতে রান্নাবান্না ইত্যাদি কাজকর্মের জন্যে হাতিয়ে এনেছে। এ-রকম কাজেব মানুষ সচরাচর পাওয়া যায় না। পারুলের সঙ্গে আছে তার এক বোনপো— বিষ্টু, বিশ-বাইশ বছবের ছোকরা। এক ধরনের শিক্ষা ছাড়া এসব বাড়িতে কাজ করা যায় না। মীনার বাপের বাড়িতেই পারুল সে-শিক্ষা পেয়েছিল, বোনপোকেও সে শিখিয়ে নিয়েছে। দাদাবাবু দিদিমণি সম্পর্কে তারা কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না, অনাবশ্যক প্রশ্ন করে না কখনও, অপ্রয়োজনে ঘরের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করার অভ্যাস তাদের নেই।

যতিকিশোর নিজের ঘরে এল। বিষ্টু যতিকিশোরকে দেখতে পেয়েছিল, ঘরে এসে বাতি জেবলে পাখা চালিয়ে দিল। ঘরে এসে যতিকিশোর দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে যেন মাথায় গায়ে বাতাস লাগাল পাখার, তারপর জানলার দিকে সোফায় গিয়ে বসল। এই ঘরটা উত্তরমুখো। মীনার ঘর ঠিক পাশে নয়, মাঝখানে আরও একটা ঘর আছে, বসার। মীনার ঘর দক্ষিণমুখো। যতিকিশোর ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে বিশ্রাম করছিল। বিষ্টু কাচের ডিসের ওপর জলের গ্লাস বসিয়ে এনেছিল—ঠাণ্ডা জল, রেখে গেল।

সরসীদের বাড়ির মতন বাতাস এখানে আসে না। আসার কথা নয়। পাশের

ফ্ল্যাট বাড়ির বাড়তি জায়গায় বাগান মতন আছে খানিকটা. এক জোড়া সাব: গাছ চোখে পড়ে জানলা দিয়ে, সামান্য বাতাসও আসে।

যতিকিশোর সামান্য জল খেল, বসে থাকল আরও কিছুক্ষণ, তারপর উঠে সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

যতিকিশোরের এই ঘর তার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। মীনার ঘর থেকে চলে আসার পর এই ঘরটাকে সে অকারণ আসবাবপত্রে ঠাস করে রাখে নি। খাট, আলমারি, হালকা গোছের একটা ওআর্ডরোব, লেখার ছোট টেবিল, দু-একটা সাধারণ সোফা—মোটামুটি এই হল অসবাব। দেওয়াল প্রায় ফাঁকা। একটি মাত্র পুরোনো ছবি দেওয়ালে, যতিকিশোরের এক বন্ধু দিয়েছিল, এক জোড়া বুনো ঘোড়া কোনো পাহাড়ী নদীর কাছে দাঁড়িয়ে যেন জল খাবার চেষ্টা করছে। লম্বাটে ছবি: জঙ্গল, বুনো ঘাস, আগাছা, পাথর আর নদীর গা ঘেঁষে দাঁড়ানো ঘোড়া দুটোকে চমৎকার দেখায়।

চা শেষ করে যতিকিশোর অন্যমনস্কভাবে ঘরের চারদিকে তাকাবার সময় একেবার ছবিটা দেখল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল। মাথার মধ্যে কেমন এক ভার ভার ভাব লাগছে. যেন সর্দি জমেছে, কপালের সামনের দিকটায় টিপটিপে ব্যথা, চোখ দুটোও বার বার বুজে ফেলতে হচ্ছিল। এই ধরনের মাথা ভার থেকেই শেষে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। তার আগে ঘাড়ের দিকটা টনটন করে ওঠে। এটা ব্লাডপ্রেসাব নয়। নার্ভের ব্যথা, টেনসান থেকে হচ্ছে বোধ হয়। ডাক্তাররা সেই রকম কিছু বলেছিল।

যতিকিশোর কপালের কাছে হাত রেখে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল, নীচু মুখে, কার্পেটের ওপর তার পা মাঝে মাঝে নড়ছিল, চটি জোড়া পাশে পড়ে আছে, পাজামার তলার দিকে একটা খয়েরী দাগ, কেমন করে যেন লেগে গেছে।

আরও খানিকটা অপেক্ষা করে যতিকিশোর বুঝল, ওষুধ তাকে খেতেই হবে। বাড়িতে খানিকটা হুইস্কি পড়ে আছে, জিনও আছে বোধ হয়। এসব এখন খাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করল না। একটা বড়ি-ফড়ি খেতে হবে।

যতিকিশোর উঠে পড়ল। বিছানার পাশে মাথার কাছে তার নানা ধরনের দরকারী টুকিটাকি থাকে, ওষুধ, পড়ার চশমা, ছোট টর্চ, লাইটার, দু-একটা বইটইও।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যতিকিশোর বিষ্টুকে ডেকে জল দিতে বলল আবার।

নানা ধরনের ওষুধের মধ্যে যতিকিশোর একটা বেছে নিল। এই ওষুধটা তার বেশ সয়। অফিসেও রেখে দিয়েছে একট ফাইল।

বিষ্টু জল আনলে যতিকিশোর বড়িটা খেয়ে ফেলল।

সিগারেট ধরাল। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য। এখন বোধ

হয় সাত সাড়ে-সাত বেজেছে। সাব্ গাছের মাথার ওপর অন্ধকার; কোথায় যেন একটা হুল্লোড়ে বাজনা বাজছিল।

যতিকিশোরের ইচ্ছে হচ্ছিল, সে আবার এখন সরসীর বাড়ি চলে যায়। শান্ত, নির্জন, সাধারণ সেই ঘর, মাঠঘাট থেকে ছুটে আসা সেই উন্দাম বাতাস, অন্ধকার, মিটমিটে লণ্ঠনের আলো আর সরসী—তবু যেন সেখানে কিছু স্বস্তি রয়েছে, শান্তি আছে। এখানে কিছু নেই। যতিকিশোর বড় ক্লান্ত।

সিগারেটটা নিবিয়ে দিল যতিকিশোর। ভাল লাগছিল না। ঘরের আলোও অসহ্য। বাতি নিবিয়ে দিল। দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে থাকতে থাকতে যতিকিশোর বুঝতে পারল, ওষুধটা কাজ করতে শুরু করেছে। বুঝতে পারল, কেননা কপালের দিকটায় ব্যথা মরে কেমন শিথিল ভাব এল। সে দেখেছে, এই ওষুধটা খাবার পর তার কপালের কাছটা সামান্য ঠান্ডা লাগে, বার কয়েক হাই ওঠে, চোখ ক্রমশই ছলছলে হয়ে যায়।

অলসভাবে যতিকিশোর হাত দুটোকে মাথার পাশে ছড়িয়ে দিল, আবার উঠিয়ে ঘাড়ের তলায় রাখল, অন্ধকারে ছাদের দিকে তাকাল, পাখা ঘুরছে, শব্দ হচ্ছিল।

তারপর আরও যেন নির্ভার, হালকা হয়ে গেল যতিকিশোর, সমস্ত মন যেন ভাসছে, শরীর হালকা..., কোথাও কোনো তীব্র ব্যথা অনুভব করতে পারল না যতিকিশোর।

কিছুই নয়, তবু চেতনার কোথায় যেন বাতাসে ওড়া পাতলা কাপড়ের মতন বর্তমান ও অতীতের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান দুলে দুলে উঠছিল। ঝাপটা মারছিল। এক এক সময়ে দমকা স্মৃতি যেন ছুটে এসে আড়ালটাকে সরিয়ে দিচ্ছিল। খানিকক্ষণ এইভাবে কাটল, তারপর হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শুকনো কাপড়ের মতন হুস করে এই আড়াল যেন কোথায় উড়ে চলে গেল।

যতিকিশোর নিজের বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছিল। ওই, যে-ছেলেটি শীতের ভোরে মা'র লেপের তলায় ঢুকে মাকে পাশ বালিশের মতন জাপটে শুয়ে আছে, যে-ছেলেটি তাদের বাড়ির ডালিমগাছের তলায় রোদে বসে ঘুড়িতে সুতো বাঁধছে, টিনের সুটকেস ঝুলিয়ে কলকল করতে করতে বন্ধুদের সঙ্গ স্কুলে যাচ্ছে, সন্ধ্যেবেলায় লণ্ঠনের আলোয় যাকে মেগাস্থিনিসের ভারত ভ্রমণের পড়া মুখস্থ করতে হচ্ছে—সেই ছেলেটিই যতিকিশোর বা যতি। এতটা দূরে এসে পেছনে তাকালে মনে হয়, যৌবনোত্তীর্ণ যতি যেন বাল্যের যতিকে পৃথক মানুষ হিসেবে সহানুভূতি, স্নেহ, মমতার সঙ্গে লক্ষ করছে।

যতিরা ছিল শেরপুরে। জায়গাটা পুরোনো। শহরটাও কম বড় নয়। আশেপাশে জঙ্গল ছিল, পাহাড়ের ঢল ছিল, ছিল অভ্র, আশেপাশে কয়লা

আরও কিছু কিছু সম্পদ। রেল কোম্পানী মস্ত কলোনী বসিয়েছিল, ছোট লাইনও পেতে দিয়েছিল পুবে আর উত্তরে, অভ্র আসত, কয়লা আসত, পাহাড়-কাটা পাথর আসত গাড়ি গাড়ি।

যতির ঠাকুরদা মাঝ-বয়েসে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বিহারে অভ্র নিয়ে ব্যবসা করতে। ব্যবসাপত্র জমিয়ে ফেলেছিলেন ভালই, কিন্তু ষাট পেরুবার আগেই মারা যান। মারা যাবার আগে শেরপুরে একটা বাড়ি তৈরী করতে পেরেছিলেন—যার নাম ছিল 'শান্তি ভবন'। শান্তি ঠাকুরমার নাম, পুরো নামটা শ্রীমতী শান্তিময়ী দাসী। যতি ঠাকুরদাকে মনে করতে পারে না, ঠাকুরদা যখন মারা যান যতি তখন বছর দুয়েকের অবোধ অজ্ঞান শিশু। ঠাকুমাকে তার স্পষ্ট মনে আছে। কাশীর পাকা পেয়ারার মতন গায়ের রঙ, ঢলঢলে মুখ, মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা, সাদা থান পরনে। বুড়ি সারা গ্রীষ্মকাল সকালে শিবমন্দিরে শিবের মাথায় জল দিতে যেত, নিকেলের চশমা পরে মহাভারত পড়ত, বাবাকে ডাকত 'খোকন' বলে। যতি যখন খানিকটা বড় তখন বাবাব খোকন নাম শুনে বেশ মজা পেত। ঠাকুমা যতিকে বলত ছোট খোকন। অর্থাৎ বাবা বড় এবং সে ছোট খোকন।

যতির বাবা ব্যবসাপত্রে তেমন পাকা ছিলেন না। ছোটাছুটি তাঁর ধাতে পোষাত না। পৈতৃক ব্যবসাকে তিনি অন্যের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষিতীশ রায়ের সংগে রেলের কনট্রাক্ট ধরেছিলেন। বাবার কাজ ছিল অফিস নিয়ে। বাইরের কাজটা ক্ষিতীশ রায় দেখতেন।

যতির পর মতি। মতির পর এক বোন হয়েছিল; আঁতুড়েই মারা যায়। তার অনেক পরে হাসি। ঠাকুমা মারা যায় তার আগেই।

যতিদের পরিবার শেরপুরে পুরোনো বাঙালী পরিবারের অন্যতম হয়ে পড়েছিল। দু' তিন পুরুষের বসবাস। ঠাকুরদার আমলেই তাদের পারিবারিক মর্যাদা জুটেছিল, অর্থের জন্যে ততটা নয় যতটা ঠাকুরদার চরিত্রের জন্যে: মানুষটি ছিলেন ধীরস্থির প্রকৃতির, পরিশ্রমী, সাদাসিধে, আবার জেদী। শহরের বাঙালী মহলে তাঁর সুনাম ও শ্রদ্ধা ছিল। জুবিলী স্কুলে তাঁর কিছু দেওয়া-থোওয়া ছিল, মেয়ে স্কুলের পত্তন করেন যে ক'জন তাঁদের মধ্যে ঠাকুরদা ছিলেন, রাজবাড়ির সংগে শেরপুরের নীচু বাজার নিয়ে তুমুল কান্ড হয়. ঠাকুরদা শ' দুয়েক বাঙালী বিহারী নিয়ে লাঠি হাতে নীচু বাজার আগলে রেখেছিলেন। রক্তারক্তি কান্ড ঘটেছিল; কিন্তু সেই লড়াইয়ে ঠাকুরদারা জিতেছিলেন, অবশ্য মামলা মোকদ্দমার পর। এসব গল্প যতি শুনেছে, বাড়িতে এবং বাইরে।

বাবা সে-তুলনায় বরাবরই নিরীহ, নরম ধাতের মানুষ। খানিকটা ভীতু গোছের। ব্যবসায় যত রকম মাথা খেলাবার দরকার করে বাবার মাথা অত খেলত

না। ক্ষিতীশ রায়—মানে ক্ষিতীশকাকা ছিলেন বাবার বন্ধু। তিনি পাশে না থাকলে বাবাকে বিপদে পড়তে হত। তবু বাবার অন্য কিছু গুণ ছিল, মার্জিত, ভদ্র, সদাশয়, বিনয়ী। বাবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ায় কোথায় যেন বাধা ছিল, লোকে তাঁকে সম্মান করত কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করতে পারত না। হয়ত বাবার মার্জিত ব্যবহারের মধ্যে এমন কিছু আভিজাত্যের ভাব ছিল যা বাধা হয়ে দাঁড়াত। ঠাকুরদা ছিলেন কালীভক্ত। বাবার ধর্মাচরণ ছিল বৈষ্ণবজনোচিত; দোলপূর্ণিমায় বাড়িতে উৎসব হত, বাঁকুড়া থেকে গগন কীর্তনিয়া আসত কীর্তন গাইতে।

এমন একটি পরিবারের ছেলে হয়ে যতিকিশোরই প্রথম ঘা দিল শান্তি-ভবনের ভিতে। তারপর, একের পর এক। লোকে বলত, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়, এ একেবারে তার উলটো, দেববংশে দৈত্য।

যতিকিশোর এখনও সেই দিনটিকে মনে করতে পারে। তখন শেরপুরে একটা নতুন ঢেউ এসে পড়েছে, রেলের বড় মাঠে গুর্খাদের ক্যাম্প, আরও দূরে একটা ছোটখাট মিলিটারি ছাউনি, গাজিয়া তলাও-য়ে মস্ত তিনটে টিনের শেড্ দাঁড়িয়ে আছে অ্যামুনিশান প্রোডাকসনের স্টোর হিসেবে, সেখানে এন্তার লোহার শিট, অ্যালুমিনিয়াম শিট, পেরেকের বাক্স। কুলিকামিনরা মালগাড়ি থেকে মাল খালাস করে, আবার ভরে। লাল পতাকা, যা কিনা শেরপুরে আগে কোনোদিন কেউ উড়তে দেখেনি, দুটো চারটে করে উড়তে শুরু করেছিল। যুদ্ধের সেটা শেষ মুখ। শেরপুরে মজদুর ইউনিয়নের অফিস হয়েছে নীচু বাজারে, পার্বতীবাবুর কাঠগোলার পাশে। সেখানে লাল পতাকা, আর টিমটিমে লণ্ঠন দেখা যায়।

শেরপুরের কংগ্রেসী পাণ্ডা ছিলেন দুজন, বেণীনন্দনবাবু আর মানিকবাবু। বেণীবাবুকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছিল। মানিকবাবু আগেই জেলে গিয়েছিলেন। কিছু কংগ্রেসী আগে থেকেই গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে ছিল। বিয়াল্লিশের ঝড় অনেক আগেই থেমে গেছে; যুদ্ধও ফুরিয়ে আসছে। অবশ্য তখন সেটা বোঝার উপায় ছিল না। আর যতিকিশোর—সে তো তখন ছেলেমানুষ, স্কুলে পড়ে, সেভেন কি এইট ক্লাসে—সে কিছু-বা বুঝবে। শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারত, শেরপুরের মতন শহরটাও লোকেজনে ব্যস্তসাপত্রে ফেঁপে উঠছে; স্টেশনের মালগুদোমের গায়ে আরও একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম হয়েছে মাল বোঝাইয়ের—জঙ্গলের কাঠ যাচ্ছে, পাথরের নুড়ি যাচ্ছে, কয়লা বোঝাই ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে, গাজিয়া তলাওয়ের শেড থেকে লোহার শিটও যাচ্ছে কানপুর আর জব্বলপুর। শহর ফাঁপছে বটে, কিন্তু তলায় তলায় কিছু লোক সাহেবসুবোদের ওপর রাগে ঘৃণায় গজরাচ্ছে।

এই সময়ে শহরে আচমকা একটা কাণ্ড হয়ে গেল। রেলের এক সাহেব

বাজারের শেষ দিকটায় কুলি ধাবড়ার একটা বাচ্চাকে গাড়ি চাপা দিয়েছিল। দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, নাকি যাচ্ছিল না—সেটা শোনার আগেই কিছু লোকজন জুটে গিয়ে সাহেবকে ঘিরে ফেলে। গোলমাল, হইচই থেকে হাতাহাতি, সাহেব বেপরোয়া লাথি ঘুঁষি চালাতে লাগল, আর গালাগাল। নিজেও মার খেল। এমন সময় অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের কোয়ার্টার্স থেকে কিছু লোক এসে সাহেবকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। দু' পক্ষে ছোটখাটো একটা হাঙ্গামা হয়ে যায়।

হাঙ্গামাটা ওপরে ওপরে মিটে গেল, কিন্তু রাগ, ঘৃণা, আক্রোশ মিটল না। সাদা চামড়ার ওপর মন আগে থেকেই বিষিয়ে ছিল, আরও বিষিয়ে উঠল, সেই সঙ্গে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ওপরেও। লোকে গালাগাল দিত, বলত. শালা দোঁআশলার জাত, কুত্তা, শালারা ভাবছে বিলেতে জন্মেছে। হারামী।

যতিকিশোরদের জুবিলী স্কুলে চার পাঁচটা ছেলে পড়ত, যেমন অ্যালভিন দাস, লেসলি, কৃষ্ণপদ মনডিয়াল এইসব। এদের কেউ কেউ বাঙালী, কেউ বেহারী। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানও নয়, এদেশী খৃশ্চান। তাদের বাবা কাকারা রেলেই কাজ করত, কেউ গার্ড, কেউ ফায়ারম্যান, কেউ বা লোকোতে কাজ করে। স্কুলের কয়েকটা বড় বড় ছেলে কোথা থেকে উসকোনি পেয়ে তাদের পেছনে লাগল।

এদের পেছনে লাগতে গিয়ে একদিন গন্ডগোল বেধে গেল। টিফিন পিরিয়ডে স্কুলের মাঠে মারপিট, ঘুষোঘুষি, কে কার জামা ছিঁড়ে দিল, জুতো ফেলে দিল, ইটের টুকরো উড়তে লাগল, ঢিলের চোটে স্কুলের জানালার দু-চারটে শার্সি ভাঙল। মাস্টার মশাইরা এসে ঝগড়া থামালেন।

যতিকিশোরের সঙ্গে পড়ত রুবেন ডলবি। রুবেনের চেহারা ছিল কাঠখোট্টা ধরনের, ডানপিটে ছেলে। টিফিনের জেব ক্লাসের মধ্যেও পুরো থামেনি। স্কুলের ছুটির পর বাইরে বেরুতেই ক্লাসেব ছেলেরা আবার তার পেছনে লাগল। রুবেন সাইকেলে করে স্কুলে আসত, নতুন সাইকেল। সে সাইকেলের পাম্প খুলে নিয়ে তেড়ে এল। সামনেই ছিল যতিকিশোর। বাস্তবিকপক্ষে সে সারাদিনেব এই ঝগড়াঝাটির মধ্যে তেমন ছিল না, মজা করেছে, হাততালি দিয়েছে, তামাশা করেছে। রুবেনকে সাইকেলের পাম্প হাতে তেড়ে আসতে দেখে কি যে হয়ে গেল যতিকিশোরের—সে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে রুবেনের ওপর লাফিয়ে পড়ল। আচমকা লাফিয়ে পড়ায় যতিকিশোর রুবেনকে মাটিতে ফেলে দিতে পারল. পাম্পটা ছিটকে কোথায় পড়ে গেল রুবেনের হাত থেকে। দু-জনে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল, কিল চড় লাথি, এ ওকে উলটে দেয় একবার, ও একে চিত করে ফেলে। ক্লাসের ছেলেরা স-উল্লাসে যতিকে বাহবা দিতে লাগল চার দিক ভিড় করে। দু-জনে উঠে দাঁড়াল, লাথি চালাল, আবার জাপটাজাপটি করে মাটিতে পড়ল। যতিকিশোর হেরে যাচ্ছিল, তার দম

ফুরিয়ে আসছিল। এমন সময় কে যেন একটা পেনসিল কাটা ছুরি খুলে তাদের কাছে ফেলে দিল। যতিকিশোর হাত বাড়াবার আগেই রুবেন হাত বাড়িয়ে দিল—যতিকিশোরও ছাড়ল না। ছুরিটা ধরতে গিয়ে হাত কেটে গেল যতিকিশোরের। রুবেন তখন ভয় পেয়ে গিয়েছে। পালাতে পারলে বাঁচে। ছুরিটা কেউ ধরতে পারে নি। যতিকিশোর রুবেনের গলা টিপে ধরল। হাতে রক্ত।

ঘটনা আর বেশীদূর গড়াতে পারল না। খবর পেয়ে ড্রিল স্যার ছুটে এসে দুজনকে আলাদা করলেন। তারপর একদল ছেলের সঙ্গে যতিকিশোর চলল ছোট হাসপাতালে। সঙ্গে ড্রিল স্যার। যতির ডান হাতটা তিনি রুমাল দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন।

ছোট হাসপাতাল থেকে বন্ধুরা তাকে বাড়ি নিয়ে এল। হাতের যন্ত্রণা, রক্তপাত, শরীরের নানা জায়গায় ব্যথা, ফোলা, কালসিটে সত্ত্বেও যতিকিশোর অনুভব করছিল বন্ধুরা তাকে বীরের মতন মর্যাদা দিয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। প্রশংসা, প্রশংসা, প্রশংসা। কত রকম প্রশংসা, তার সাহসের, তার লড়াইয়ের।

বাড়ি ঢুকতেই মা ছুটে এল। কেঁদেকেটে একসা।

সন্ধ্যে রাত্রে জ্বর এল যতিকিশোরের। মনে পড়ে, বাড়িতে যতিকিশোর বিছানায় শুয়ে আছে। জ্বর বাড়ছে। মা মাথার পাশে বসে পাখার বাতাস করছে আর জলপটি দিচ্ছে। বাবা ভয় পেয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবু এসে দেখে গেছেন, বলেছেন ভয় নেই—আজ খানিকটা জ্বর হবে—কাল কমে যাবে।

ঘরে মা আর বাবা। যতিকিশোর জ্বরের ঘোরে ক্রমশই বেহুঁশ হয়ে আসছিল। লণ্ঠন জ্বলছে ঘরের এক কোণে।

হঠাৎ যতিকিশোর শুনল, বাবা মাকে বলছেন, 'তোমার ছেলে শেষ পর্যন্ত স্কুলে ছুরি মারামারি করে এল!'

মা অপরাধীর মতন বলল, 'ছেলেমানুষ, বুদ্ধিসুদ্ধি কম ..'

'হোক না কম, তা বলে ছুরি নিয়ে মারতে যাবে? সেই ছেলেটাব গায়ে চোখেমুখে লাগলে কি হত? থানা-পুলিস করতে হত না?...এসব এদের মাথায় কে ঢোকায়, কেমন করে ঢোকে!. ডলবির ছেলেব দোষটা কোথায়? সাহেবদের সঙ্গে তাদের কি আছে? সে বেচারীর অপরাধটা কোথায় হল?'

মা কোনো জবাব দিল না। অপরাধীর মতন বসে থাকল। ছেলের মাথার জলপটি পালটে দিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

বাবা অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'হুজুগ। এই হুজুগ এখন কিছুদিন চলবে, তারপর থেমে যাবে। হুজুগ চিরকাল থাকে না, অথচ তোমার ছেলে হুজুগে পড়ে ছুরি ধরতে শিখে গেল। ছি ছি! আমাদের বংশে এই প্রথম...।'

মা বোধ হয় শ্বশুরের কথা তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাবা ধমক দিয়ে

বাধা দিলেন। বললেন, 'চুপ করো। যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলো না। আমার বাবার লাঠি ধরা আর তোমার ছেলের ছুরি ধরা এক জিনিস নয়...।'

মা চুপ। অভিমানে, ক্ষোভে, দুঃখে তার কান্না এসে গিয়েছিল।

বাবা আর কিছু বললেন না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যতিকিশোর জ্বরের ঘোরে এই প্রথম বুঝতে পারল, বাবাকে সে ঘৃণা করছে, তার অসহ্য রাগ হচ্ছিল বাবার ওপর। বাবা ভীতু, বাবা থানা-পুলিসের ভয়ে কাঁপছে। বাবা নিজের বাবার বেলায় গর্বে মরছে, ছেলের বেলায় লজ্জায়।

যতিকিশোরের কিন্তু কোনো রকম আফসোস হচ্ছিল না। স্কুলের ছেলেরা. বন্ধুরা, সারা স্কুল তাকে যেন কাঁধে চাপিয়ে ফুটবল খেলার মাঠ থেকে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে আসছে—এই ধরনের কোনো অনুভবের মধ্যে সে বেহুঁশ হয়ে গেল জ্বরের ঘোরে।

হাত সারল। যতিকিশোরও দেখল, আগে স্কুলে বন্ধুবান্ধবদের কাছে, পাড়ায় সে একেবারে সাধারণ ছেলে ছিল, কিন্তু এখন তার মর্যাদা বেড়ে গেছে। ছেলেরা তার সাহসকে, রাগকে, তার কথাকে ভয় পায়। সে জীবনের প্রথম লড়াইয়ে জিতে গেছে, জিতে গিয়ে খাতির জুটিয়ে ফেলেছে।

যতিকিশোর তখন থেকেই যেন অন্য যতিকিশোরের বীজ নিজের মধ্যে বপন করে তার চারপাশে জল ঢালতে লাগল।

জীবনের অনেকটা পথ সে এই ভাবেই কাটিয়ে এল, যতিকিশোর নিজে যাকে বলত—জেতার খেলা। সে বরাবর উইনার্স গেম্ খেলেছে। খেলতে খেলতে চল্লিশ পেরিয়ে হঠাৎ সে থামল, তারপর একদিন অনুভব করল, সত্যিই কি সে —যতিকিশোর মিত্র, রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়ার মতন দিগ্বিজয় সেরে ফিরে এসেছে—সর্বত্র জিতেছে? নাকি, তার এই খেলা শুধু হারের?

৫

সরসী পরিহাস করে বলল, "একে আজ সারাদিন ঘিনঘিনে বৃষ্টি, তার ওপর তোমার ওই কালো মুখ, আমার আর ভাল লাগছে না বাপু! চলো উঠি, কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরতে হবে তো!"

যতিকিশোর ঘাড় তুলে বাইরের দিকে তাকাল। কাচের ভেতর দিয়ে ভাল দেখা যাচ্ছে না, গাড়ি-বারান্দার তলায় লোক জমে আছে, আলোর মধ্যে দিয়ে ময়লা আভা আর বৃষ্টির ভিজে একটা ছবি অনুমান করা যায় মাত্র।

'তুমি কোন্ বাসে যাবে?' যতিকিশোর জিজ্ঞেস করল।

রাত হয়ে গেছে বলে সরসী ভাবছিল। বৃষ্টিও পড়ে যাচ্ছে। আজ সকাল থেকেই পশলায় পশলায় বৃষ্টি, মেঘলা। রক্ষে এই—ঝমঝমিয়ে একটা পশলাও নামে নি—নয়ত কলকাতা ভাসত, সরসীকেও বিপদে পড়তে হত।

সরসী বলল, "আগে রাস্তায় নামি, দেখি কি অবস্থা! বাসে উঠতে পারলে হয়।"

বিল দেওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। রেস্টুরেণ্ট থেকে বাইরে এসে মনে হল, যতটা মনে হচ্ছিল ততটা নয়। টিপটিপে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় লোকজন অন্যদিনের তুলনায় কম, অনেকে মাথায় রুমাল বা ব্যাগ চাপা দিয়ে হাঁটছে, ছাতাও রয়েছে, একজন ফুলঅলা হাতে মালা সাজিয়ে মজার গলায় হাঁকছে: একটা টাটকা মালা লিয়ে যান দাদু, ঠাকুরকে দেবেন, দিদিমাকে দেবেন...লিয়ে যান।

ছাতা খুলতে খুলতে সরসী হেসে ফেলল। নীচু গলায় বলল, "কি অসভ্য।"

যতিকিশোরের হাতে ছাতা ছিল না, অ্যাটাচি কেস ছিল। বলল, "তুমি এখান থেকে বাসে উঠলে বসতে পারবে না। সেই আউটরাম থেকে যেটা ছাড়ে —কত নম্বর যেন—তাতে যাও।"

"আউটরামে অনেকগুলো বাস পাওয়া যাবে।"

"তবে তাই চলো। আমি একটা ট্যাক্সি ধরি। তোমায় আউটরামে বাসে তুলে

দিয়ে চলে যাব।"

"ট্যাক্সি পাবে কি?"

"চলো দেখি...।"

রাস্তা পেরুলেই মুশকিল। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়ি, বাস, মানুষজন সবই যেন পালাচ্ছে, ময়দান আর ট্রাম গুমটির দিকে অর্ধেক আলো জ্বলছে না, অন্ধকার মতন, কোথায় ট্রাফিক পুলিস, কোথায় গাড়িগুলো থামছে কিংবা বাঁক নিচ্ছে বোঝাই মুশকিল।

মেট্রো সিনেমার দিকে ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

ট্যাক্সিতে বসে যতিকিশোর বলল, "আগে আউটরাম চলো।"

ট্যাক্সিঅলা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে যতিকিশোরদের যেন ভাল করে দেখল।

যতিকিশোর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল, মাথার চুলের ওপর রুমালের চাপ দিয়ে জলও মুছল। সামান্য ভিজে।

সরসী বলল, "ছাতার তলায় এলেই পারতে।"

হেসে যতিকিশোর বলল, "তাতে লাভ হত না, তুমিও ভিজতে।"

ট্যাক্সি ডান দিকে মোড় নিয়ে সোজা এগুলো।

"বর্ষা শুরু হয়ে গেল, কি বলো?" যতিকিশোর বলল।

"তা শুরু হওয়া উচিত। আষাঢ় পড়ে গেছে কবে—আট দশ দিন হল।"

"বর্ষায় তোমায় খুব ভোগায়।"

"উপায় কি! বর্ষা তো বাদ দিয়ে রাখা যাবে না। সবই নিতে হবে...।"

যতিকিশোরের কানে কথাটা লাগল। তাকে লক্ষ করে বলল নাকি? ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে থাকল যতিকিশোর কয়েক মুহূর্ত, সরসীর বাদাম-রঙ শাড়ির ওপর কয়েকটা লালচে ফুলের ছিট, শাড়িটা ফুলে আছে, খসখসে, বৃষ্টির দিনে নাইলন-টাইলন পরেছে হয়ত।

সিগারেট ধরাল যতিকিশোর, আজ কলকাতার এই দিকটার কী হল! রাস্তা মাঠ সব অন্ধকার, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, গাড়ির আলো অন্ধকারের গায়ে কত রকম খেলা করে যাচ্ছে।

"তুমি আমায় বললে?" যতিকিশোর বলল।

"বললাম।"

"হ্যাঁ..., আমি তো কিছু বাদ দিতে যাচ্ছি না, যা হয়ে গেছে তাকে কিছু করা যায় না, বাদ দেওয়া অসম্ভব। আমি বরং সেই পেছনের মধ্যে কেমন করে জড়িয়ে যাচ্ছি..."

সরসী ইচ্ছে করেই কথাটার গুরুত্ব দিল না। যতিকিশোরের হাতের কাছে চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "কেন জড়াচ্ছ? আমি তোমায় বারবার বলেছি, ওসব যা আছে থাক—মিছে তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তোমার কি লাভ!"

যতিকিশোর বড় করে নিঃশ্বাস নেবার মতন করে সিগারেটের ধোঁয়া গলায় নিয়ে বসে থাকল।

আউটরামে এসে সরসী বলল, "কাল পরশু আমি আর আসছি না। শনিবার তুমি তা হলে যাচ্ছ?"

"যাচ্ছি।"

"আমি একটা কাজ সেরে পাঁচটা নাগাদ দোকানে থাকব।"

"থেকো।"

"সোমবার ছুটি, মনে আছে?"

যতিকিশোর ট্যাক্সি ড্রাইভারকে প্রাইভেট বাসের জায়গাটায় নিয়ে যেতে বলল।

নামল সরসী। বৃষ্টির ফোঁটা সামান্য বড় হয়েছে। দরজা খুলতে খুলতে বলল, "আসি। শনিবার..."

সরসী চলে গেল বাসের দিকে। যতিকিশোর ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "ল্যান্সডাউন...।"

ফাঁকা বাস। জনা দুই মাত্র লোক ড্রাইভারের পিঠের দিকের সিটে বসে আছে। বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে।

বাসের ডান দিক ঘেঁষে মাঝামাঝি মেয়েদের জায়গায় বসল সরসী। গাড়িটা নতুন হয়ত। সিটগুলো খুব ফোলা ফোলা। জানলা বন্ধ। বাসের মধ্যে সব কটা বাতি জ্বালা নেই। সরসীর দিকে আলো নেবানো ছিল।

আরাম করে বসল সরসী। তার আর কোন দুশ্চিন্তা নেই, বাস যখনই ছাড়ুক সে তার জায়গায় পেঁছে যাবে। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে একটু হাত মুছল, কপাল মুছল, রুমাল বাখল, কয়েক মুহূর্ত আলসভাবে তাকিয়ে থাকল সামনের দিকে; আরও দু'জন এল সামনের দরজা দিয়ে।

জানালার কাঠে মাথা সামান্য হেলান দিয়ে চোখ আধবোজা করে বসে থাকল সরসী। পরশু বাদ দিয়ে শনিবার যতি আসবে। যতি এর মধ্যে আরও একবার গিয়েছিল। সেদিন, না সেদিন নয়, পরের দিনই প্রথম বৃষ্টি নামল বছরের। দুপুরে নামল আর সন্ধ্যেয় ছাড়ল। তার পরও সারা রাত কী মেঘের ডাক আর বিদ্যুতের চমক।

প্রথমবার সরসীদের ওখানে গিয়ে যতি সারাক্ষণই বড় আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত হয়ে ছিল। অপরাধী অপরাধী ভাব ছিল একটা। সরসীর সঙ্গে গল্প করার সময় অবশ্য খানিকটা স্বাভাবিক হতে পারত, কেননা দুজনের মেলামেশা যতিকে মোটামুটি সহজ করে ফেলেছিল। মাসির জন্যেই তার সঙ্কোচ বেশী ছিল, সরসীর জন্যেও যে একেবারেই না—তাও অবশ্য নয়।... যাক্‌গে, পরের বারে

যতি আগের মতন অতটা আড়ষ্ট থাকল না।

সরসী জানে যতির মধ্যে এই যে লজ্জা, কুণ্ঠা, গ্লানি সেটা সহজে যাবার নয়। মুখে অনেকবার, অসংখ্যবার সরসী ওকে বলেছে,—কেন তুমি পুরোনো কথা নিয়ে অত ভাবছ, আমি কি তোমায় সেসব মনে করিয়ে দিতে এসেছি, না আজ শোধবোধ করতে এসেছি, তুমি ওসর মনে এনো না, ভুলে যাও—, কিন্তু মনে মনে সরসী জানে, যতি তা ভুলতে পারছে না। তা ছাড়া সরসীরাই তো শুধু অতীত নয় যতির—তার আরও কত লজ্জা গ্লানি অন্যায় ভুল পড়ে আছে অতীতে।

বাসে লোক উঠল আরও, একটি বউ এসে সরসীর পাশে বসে আবার উঠে গিয়ে লম্বা সিটে বসল। বাসটা ছাড়ব ছাড়ব করছিল। বৃষ্টির ঝাপটা এল আচমকা, বড় বড় ফোঁটা, বাসের দু-একটা খোলা জানলা বন্ধ হওয়ার শব্দ হতে লাগল।

সরসীর দিকে জানালা বন্ধ ছিল। তাকে ব্যস্ত হতে হল না।

বাস ছাড়ল।

টিকিটের খুচরো পয়সা হাতে নিয়ে তৈরী থাকল সরসী। যেন টিকিটটা কাটা হয়ে যাবার পর সে বেশ নিশ্চিন্তে চোখ বুজে মাথা হেলিয়ে দিয়ে বসে থাকতে পারে—তাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না।

ইডেন্ গার্ডেনসের উত্তরের দিক থেকে মস্ত একটা পাক খেয়ে বাসটা যখন ঝড়ের বেগে রাজভবনের কাছাকাছি এসেছে তখন জোরে বৃষ্টি নেমে গেল, জানালার গায়ে বাসের মাথায় বৃষ্টির শব্দ হতে লাগল।

টিকিটটাও কাটা হয়ে গেল সরাসরি। নিজের জায়গায়, ঝাপসা আলো-অন্ধকারের মধ্যে আধবোজা চোখে বসে থাকতে থাকতে গালে এমন করে হাত রাখল যেন সে কিছু ভাবছে, বা উন্মনা। মনে হতে পারে, সরসী সারাদিনের চাকরি, ঘোরাঘুরি, যতির সঙ্গে একটানা দেড় দু' ঘণ্টা গল্পগাথার পর ক্লান্তিবশত তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন ঠিক নয়, সরসী যেন অনেক দূর থেকে তাদের অতীতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নানা রকম দৃশ্য দেখছিল। এই রকমই হয় তার আজকাল, যতির সঙ্গে নতুন করে দেখা হবার পর থেকে প্রথম ক'দিন খুব হয়েছিল, তারপর কমে এলেও এখনও হয়, বাড়িতে অফিসে বাসে—কোথায় নয়! বিশেষ করে যতির সঙ্গে যেদিন গল্পটল্প করে যায় সেদিন বড় বেশী হয়। কথাটা সে যতিকে স্পষ্ট করে বলতে চায় না, তবু একদিন বলেছিল: 'তোমার ছোঁয়াচ আমায় লাগিয়ো না বাপু।'

যতিই বোধ হয় ছোঁয়াচটা বেশী করে লাগিয়ে দিয়েছে। সব মানুষই কখনো না কখনো, কোন কোন সময়ে তার পুরোনো কথা ভাবে। তা বলে এই

রকম—এমন করে নিত্য কি আর ভাবতে যায়! এখন যেন সরসীর এই ভাবনা নিত্য হয়ে গেছে।

নিজের ছেলেবেলার খানিকটা সরসীর ভালো লাগে। তার পরে ভালো-মন্দে মেশানো। শেষে আর ভালো বলে কিছু নেই—সবই মন্দ, সবটাই দুঃখ আর দুর্ভাগ্য দিয়ে কাটাছেঁড়া।

সরসীর বাবা ছিল মতিহারীর লোক। নিজের পিতৃবংশের কেউ কোথাও ছিল না, সরসীর দাদু বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে নিয়েছিলেন বাবাকে। দাদুর নাম ছিল কামাখ্যাপ্রসাদ, এলাহাবাদের বাঙালী, শেরপুরে এসেছিলেন জীবিকার অন্বেষণে। যতির ঠাকুরদার মতনই। কামাখ্যাপ্রসাদ রাজবাড়িতে চাকরি করতেন, রাজবাড়ির খাজাঞ্চিখানায়; রাজার নজর পড়ায় তাঁর উন্নতি হয় অনেক—, বিশ্বস্ত কর্মচারী হয়ে ওঠেন। দাদুকে মামলা-মোকদ্দমার কাগজপত্র নিয়ে ছোটাছুটি করতে হত উকিল মোক্তার আদালতে। কামাখ্যাপ্রসাদ ঘরবাড়িও করেছিলেন শেরপুরে। কামাখ্যাপ্রসাদের দুই মেয়ে—স্বর্ণলতা আর মায়ালতা। ছেলে ছিল না। ছিল এই ভাইপো। অনেক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি করে কামাখ্যাপ্রসাদের গালে চুনকালি মাখিয়ে সে পালিয়ে যায়। আর কোনদিন শেরপুরে আসে নি। এই মানুষই নানাঘাটের জল খেতে খেতে চা বাগানে গিয়ে চাকরিবাকরি শুরু করে। সেখানেই বরাবর ছিল চাকরির শেষ দিন পর্যন্ত। সরসীর মা স্বর্ণলতা মানুষটি যে মন্দ ছিল তা নয়, তবে নামে স্বর্ণ হলেও মা'র না ছিল সোনার মতন উজ্জ্বলতা, না ছিল লতার মতন নমনীয়তা। গায়ের রঙ ছিল ফ্যাকাশে, মুখের গড়নে যাও-বা অল্পস্বল্প আলগা শ্রী ছিল, গায়ের গড়নে মোটেই তা ছিল না। কামাখ্যাপ্রসাদ বেছেবুছে এমন জামাই ধরেছিলেন যাকে তিনি নিজে কিছু দিয়ে-থুয়ে বড় মেয়ের আঁচলের খুঁটে বেঁধে দিতে পারেন। বাবা ঘরজামাই হয়ে যাবার পর সবই বাবার হাতে চলে এল। ঘরবাড়ি, অল্পস্বল্প জমিজমা। কামাখ্যাপ্রসাদ মারা গেলেন।

বাবা দেখতে মোটামুটি সুপুরুষ ছিল। গায়ের রঙ ছিল কালচে, কিন্তু চেহারাটা ভালই ছিল, টানাটানা চোখ মুখ, চওড়া কপাল। বাঙালী মহল্লায় দুর্গা পুজোর সময় থিয়েটার হত, বাবা রাজারাজড়ার পার্ট করতেন। চাকরি ছিল মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে। বাবার নানা ধরনের শখ আর নেশা ছিল। যেমন শখের মধ্যে গানবাজনার। তবলা বাজাতে পারত, বাঁশিও চেষ্টা করত। নেশার মধ্যে ছিল রাশি রাশি পান খাওয়া আর মাছ ধরা। মানুষটি একরকম নিরীহ প্রকৃতিরই ছিল, তেজটেজ বড় ছিল না, এক তাস খেলার সময় বাবার গলার আওয়াজ মাঝে মাঝে চড়ায় উঠত।

দাদু যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন কোনো ঝঞ্ঝাট হয় নি। দাদু মারা যাবার পরও দু' পাঁচ বছরের মধ্যে এমন কিছু হয় নি, সংসারে যাকে অশান্তি

বলা যায়। সরসীর বাল্যজীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে কেটেছে, শান্তির মধ্যে; বাবা-মা'র স্নেহে ভালবাসার কোনো অভাব সে বোধ করে নি। এর পরই তাদের সংসারে কেমন একটা অশান্তি এসে গেল। হয়তো আগে থেকেই আসছিল, সরসী ছোট—তার জ্ঞানবুদ্ধি অল্প বলে সে বুঝতে পারে নি। পরে সে যত বড় হতে লাগল ততই তার চোখে ধরা পড়তে লাগল, বাবা আর মা'র মধ্যে কেমন একটা চাপা রেষারেষি চলছে। কারণটা যে কী সে বুঝতে পারত না। একটা কারণ মাসি। মাসির বিয়ের জন্যে বাবা যেখান থেকে যত সম্বন্ধ আনে মা তাতে না করে। আবার মা যা আনে বাবা তাতে রাজী হয় না। মা'র ইচ্ছে মাসির এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে, যে এই শহর বা আশেপাশে থাকবে, ঘরজামাই না হোক, অন্তত এ বাড়ির সঙ্গে সকাল-বিকেল সম্বন্ধ রাখবে। বাবার তাতে আপত্তি। নিজে ঘরজামাই হয়ে জীবন কাটাচ্ছে বলে হয় এই ধরনের জীবনের গ্লানি কোথাও লাগত বাবার, কিংবা কোনো স্বার্থ ছিল যাতে বাবা মোটেই মাসিকে এখানে রাখতে চাইত না। মাসি বরাবরই খানিকটা গা ঢলানো মেয়ে ছিল। দেখতে ভাল বলে শুধু নয়, স্বভাবের মধ্যেই অহঙ্কার ছিল, পুরুষমানুষকে জব্দ করার খেলা ছিল, ছেলে-ঘেঁষা মন ছিল। চেহারার জন্যে ততটা নয় যতটা কিনা রাস্তায় হাঁটা-চলা, ছেলেদের দেখে হাসাহাসি, নিত্য সাজগোজের ঘটা দেখিয়ে মাসি পাড়ায় নিজের দুর্নাম রটিয়েছিল। মফস্বল শহরে সেই দুর্নাম সর্বত্রই ছড়িয়ে যায়। জানলার ফাঁক দিয়ে মাসির নামে পেনসিলে লেখা চিঠি পড়ত, মাঝ দুপুরে শিস দিত কেউ কেউ, গান গাইত, সন্ধ্যেবেলায় সরসীদের বাড়ির সামনে বড় বড় ছোঁড়াদের গুলতানি হত। মাসির হাসি, কাজল-পরা বড় বড় চোখের চাউনি, ঠোঁট গাল কুঁচকে কাউকে অবজ্ঞা দেখানো ভাব দেখলে ছেলেরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠত। বাবা চাইত, এ সব বন্ধ হোক, মাসি দূরে কোথাও চলে যাক বিয়ে করে। মা'র অন্য রকম ইচ্ছে ছিল। মাসির গা-ঢলানো ভাব যে মা পছন্দ করত তা নয়, মাসিকে গালাগাল দিত, দু' চারটে চড়চাপড়ও না দিয়েছে এমন নয়, কিন্তু মা চাইত দুর্নামের ভয়ে মাসিকে অন্য জায়গায় কেন পাঠাবে? দুর্নাম কি এই শহরে অন্য কারও নেই? তা ছাড়া, মা'র বাবা যে ঘরবাড়ি সামান্য জমিজমা রেখে গেছে তার আধাআধি অংশীদার মাসিও। কেন মাসিকে দূরে সরাবে মা? লোকে ভাববে, স্বর্ণ তার বোনকে বঞ্চিত করল।

বাবা তাতে একেবারে রাজী না।

এই সময় আরও পাঁচ রকম গণ্ডগোল জুটে গেল। মা'র একটা মেয়েলী অসুখ করল, বেয়াড়া অসুখ, ডাক্তার বদ্যি হোমিওপ্যাথি কিছুতেই কিছু হয় না; মাসের পর মাস বিছানায় শুয়ে। রক্তাল্পতায় ভুগছে। মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে বাবাকে নিয়ে, মানে হিসেবপত্তর গণ্ডগোল নিয়ে বাবা জড়িয়ে পড়ল।

যে লোকটা এসবের জন্যে দায়ী সেই গঙ্গা মুঙ্গেরে পালিয়ে গেছে। মাসির ধরল ফিটের ব্যারাম। শহরে একজন চোখা ছেলে এসেছিল, বেনারসের ছেলে, ব্যাংকে কাজ করত, সে মাসির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল চুপিচুপি।

দেখতে দেখতে সংসার ভাঙতে লাগল। অশান্তি আর অশান্তি। অভাব অনটন। বাবা যেন কার পরামর্শে পড়ে সামান্য জমিজমা বেচে দিল। পানের নেশা থেকে মদের নেশায় উঠল বাবা। মা একদিন মাসিকে খোলা বঁটি নিয়ে মারতে গেল, বাবা বেশ বুঝতে পারল, মা'র মাথা খারাপ হয়ে আসছে। বাবারও মাথা নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। আর মাসি? মাসি যে কত কীর্তিই করল!

একদিন বাবা কোনো কিছুই আর শুনল না। মাসির বিয়ের পাত্র ঠিক করে ফেলল। বাইরের ছেলে, বয়েস হয়েছে খানিকটা, ছোটখাটো ব্যবসা করে, বাবার কোন জানাশোনা লোকের আত্মীয়।

বিয়ে হয়ে গেল মাসির। মা'র আর সাধ্য ছিল না বাধা দেবার।

সরসীর বেশ মনে আছে, শীতের মুখে মুখে মাসির বিয়ে হল। মেসোমশাইয়ের মুখ তার একদম পছন্দ হয় নি। একেবারে গোলগাল ভোঁদার মতন মুখ, মাথার চুল পাতলা, কথাবার্তা বলার ধরনটাই যেন কেমন, বেশী কথাও বলেন না।

বিয়ের পব মাসি চলে গেল বরাকর। ওমা, শীত শেষ হতে না হতেই আবার মাসি ফিরে এল। ফিরে এসে বাবাকে যাচ্ছেতাই করল, মাকেও বাদ দিল না।

বরের বাড়িতে মাসির পোষায় নি আর কি। মেসোমশাই যে দুর্ব্যবহার করেছিলেন তা নয়, অমন স্বামী—যার কোনো তাপ-উত্তাপ নেই, যে দেমাকী বউয়ের স্বভাব বোঝে না, ছটফটে শরীর-মন বোঝে না, শুধু খাওয়া-পরা বোঝে, তাকে নিয়ে মাসি ঘর করতে পারবে না।

বাবা শালীকে কম ভালবাসত না। অনেক বোঝাল, মন ফেরাবার চেষ্টা করল, মাসি কোনো কথায় কান দিল না।

মানুষ যে কত বিচিত্র হয় তার বুঝি লেখাজোখা নেই। কে বুঝেছিল, মাসি যেমনই করুক, তার স্বভাব যেমনই হোক, মাসির মনের তলায় তলায় যে মানুষটির ঠাঁই ছিল সে হল মাসির জামাইবাবু।

ততদিনে সব তছনছ হয়ে গেছে। সরসী যথেষ্ট বড় হয়েছে। তার আর কিছু অজানা নেই। শেরপুরে তাদের নিয়ে রঙ্গ আর তামাশা, কত যে দুর্নাম! বাবারও চাকরি যায় যায়।

শেরপুরের বাড়ি বেচে দিয়ে সরসীদের পালাতে হল।

বাসটা কত দূর চলে এসেছে সরসী খেয়াল করে নি। লোক উঠছে, নামছে,

বাস থামছে, আবার চলছে, আচমকা ঝাঁকি খাচ্ছে, সরসীর পাশ থেকে মেয়েটি উঠে গিয়ে আবার কে বসেছে কিছুই খেয়াল ছিল না তার। বৃষ্টিও থেমে গিয়েছিল। খেয়াল হল বাসের মধ্যে ঝগড়া শুনে। কলকাতার বাসে ঝগড়া নতুন নয়, কিন্তু তুমুল একটা ঝগড়া লেগে যাওয়ায়, চেঁচামেচিতে বাধ্য হয়ে চোখ তুলে তাকাল সরসী। ভিড়ের মধ্যে কিছু দেখতে পেল না, তবে বুঝল শ্যামবাজার এসে গেছে।

ঝগড়ার লোকগুলো শ্যামবাজারে নেমে যাবার পর বাস আবার শান্ত হল, নতুন করে কিছু লোক উঠল।

সরসী তার মাথার পাশে জানালা নামিয়ে দিল। ঠান্ডা বাতাস এল বাদলার। এতক্ষণ কেমন গুমোট হয়ে ছিল। বাস ছাড়ার পর আবার চোখ আধবোজা করে গালে হাত দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকল সরসী।

যতি আর সরসী একই শহরের মানুষ শুধু নয়, বলতে গেলে একই মহল্লার। দু'জনের বাড়ির তফাত খুব একটা বেশী নয়, যতিরা থাকত কদমতলার পূর্বদিকে। সরসীরা থাকত তেমাথার মোড়ের দক্ষিণে। যতির ঠাকুরদা সরসীর দাদুর বন্ধুর মতন ছিলেন। তখন বাঙালী মহল্লায় এটা খুব স্বাভাবিক ছিল। সরসী অবশ্য যতির ঠাকুরদাকে দেখে নি, নিজের দাদুকে দেখেছে। যতিও দেখেছে সরসীর দাদুকে। দুই পরিবারের মধ্যে আসা-যাওয়া ছিল, মেয়েরা খুবই আসত-যেত। সরসীর আদর ছিল যতিদের বাড়িতে। ছেলেবেলায় কত করম খেলাধুলো করেছে যতি আর সরসী। সরসীর পুতুলের বিয়েতে যতি মেয়ের বাবা হয়েছিল, সরসী মেয়ের মা, সরসীর কান বিঁধোবার সময় যতি বেলকাঁটা এনে দিয়েছিল, যখন প্রথম প্রথম স্কুলে যেত সরসী—যতি তাকে স্কুলে পেঁৗছে নিজে জুবিলী স্কুলে চলে যেত। দু'জনে একসঙ্গে বাজারে গিয়ে দইবড়া খেয়েছে, লেমনেড খেয়েছে, পুজোর সময় ঠাকুর দেখেছে, আড়ি করেছে, ঝগড়া করেছে, মারপিট করেছে, আবার বন্ধু হয়ে গেছে। তুই-তোকারির সম্পর্ক ছিল দু'জনের।

খানিকটা বড় হয়েও সম্পর্ক ভাঙে নি। যতি ছেলে বলে তার খেলাধুলো আলাদা হয়ে গেল, বন্ধুবান্ধব অন্য রকম হল, তবু যতি সরসীদের বাড়ি এসে লুডো খেলত, স্নেকলেডার খেলত, তাসের ম্যাজিক দেখাত, খুনসুটি করত সরসীর সঙ্গে।

আরও পরে যতি সামান্য বদলে যেতে শুরু করল। সরসী প্রথমটায় বুঝত না। কেননা, যতি তখনও আসা-যাওয়া রেখেছিল, কিংবা সরসী নিজেই যতিদের বাড়িতে যেত। তারপর কি যে হল, দু' বাড়ির মেয়েদের মধ্যে আসা-যাওয়া কমতে কমতে বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। যতি রাস্তায় সরসীর সঙ্গে দেখা হলে কথাবার্তা বলত। তখন অবশ্য বড় দুর্নাম সরসীদের।

শেষে যতি একেবারে অন্য রকম ছেলে হয়ে গেল। সরসীদের শত্রুতা শুরু করল নানাভাবে। তাতে নীচতা নোঙরামি কোনো কিছুরই অভাব ছিল না যতিদের—মান যতির দলের ছেলেদের। মাসিকে কত রকমে হেনস্থা করেছে, বাবাকে অপদস্থ করেছে; এমন কি সরসীকেও ছেড়ে কথা বলেনি।

সরসীর খেয়াল ছিল না তার নামার জায়গা এসে গেছে। বাসটা ছাড়ার মুখে ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

বৃষ্টি নেই, কিন্তু অন্ধকার থইথই করছে চারপাশে। আকাশভরা মেঘ, বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছিল মাথার ওপর। সামান্য আগেও যে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছিল—বাতাস ভিজে, রাস্তার নীচু জায়গায় জল জমে রয়েছে।

রিকশায় উঠে বসল সরসী। সিট ভিজে, পা রাখার জায়গাটাতেও জল রয়েছে। একটা লরি একপাশে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে। দু-একটা দোকান, টিমটিম করে কুপি বা লণ্ঠন জ্বলছে। গায়ের পাশ দিয়ে আরও একটা রিকশা বেরিয়ে গেল, দু-একজন প্রায় ছুটছে। আবার বৃষ্টি আসতে পারে। চারদিকের ঘরবাড়ি ঘুটঘুটে অন্ধকারে আর বাদলার মধ্যে নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অজস্র ব্যাঙ ডাকছিল; ঝিঁঝির ডাকে যেন আকাশ বাতাস ভরে আছে। হু হু বাতাসে শীত করছিল সরসীর।

বাজারের জায়গায় কয়েকটা দোকান খোলা, লণ্ঠন জ্বলছে, একটা পেট্রম্যাক্স জ্বলছিল মিষ্টির দোকানে, রেডিয়ো বাজছে কোথাও, দু-চারটে ছেলে অজিতের দোকানের ভেতরে বসে আড্ডা মারছ রোজকার মতন।

মাঝে মাঝে সরসীর মনে হয়, যতি এখনও ধোঁকায় আছে। সে বুঝতে পারছে না—এটা সম্ভব কি না; সম্ভব কি না যে, যে-পরিবারের প্রতিটি মানুষকে একদিন সে অপদস্থ করেছে, অপমান করেছে, শহরের লোকজনের কাছে হাস্যকর করে তুলেছে, যাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল শত্রুতার, তারা আজ কি করে সব ভুলে গেল!

ভুলে যাবার বিষয় এটা নয়। সরসীও ভোলে নি; মাসিও নয়। আর যারা মনে রাখত তারা কেউ বেঁচে নেই।

যতিকে হাসপাতালে প্রথম দিন দেখে আসার পর সবসী মাসিকে যতির খবরটা দেবে কি দেবে না করে অনেকক্ষণ কিছু বলে নি। শেষে রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে মাসির সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেন হঠাৎ একটা খবর দিচ্ছে এমনভাবে কথাটা বলল। বলে মাসির মুখের দিকে তাকাল না, কেমন এক আশঙ্কা করেই।

মাসি খুশী হয় নি। আবার রাগে ঘেন্নায় ফেটেও পড়ে নি। সে দিন এবং আজকের মধ্যে ব্যবধান এত বেশী যে রাগে ফেটে পড়াও সম্ভব নয়। মাসি

শুধু বলল, 'আমাদের তা হলে মনে আছে?' কথাটা এমন করে বলল মাসি যেন মনে করিয়ে দিতে চাইল, যতির সেই কুকর্মের কথা মনে আছে কি না? যদি তার মনে থেকেই থাকে তবে সে কোন্ মুখে আজ সরসীকে কাছে ডাকল!

সরসী সেদিন আর কিছু বলে নি। চুপ করে গিয়েছিল।

কিন্তু ক'দিন আর চুপ করে থাকবে! যতির কাছে হাসপাতালে গেলে তার বাড়ি ফিরতে দেরী হত। প্রথম দু-একদিন এই দেরীর কোনো স্পষ্ট কৈফিয়ত দেয় নি সরসী। মাসিও খুঁটিয়ে জানতে চায় নি, কেননা সরসীর সে-বয়েস নেই যাতে দেরী করে ফেরার জন্যে মাসির মনে কোনো সন্দেহ হবে, তা ছাড়া সে অধিকারও মাসির নেই। সরসী মাসির মুখাপেক্ষী নয়, বরং মাসিই সরসীর মুখ চেয়ে আছে। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে কখনো কোনো বচসা হয় নি; জীবনে ঘা খেতে খেতে তারা শিখে গিয়েছে কার কোথায় সীমানা।

দু-চার দিন দেরীর পর সরসী নিজেই বলল, সে যতির কাছে হাসপাতালে যায়।

মায়ালতা বোনঝিকে নিশ্চয় নজর করে দেখেছিলেন, কিন্তু বোধ হয় তেমন কিছু অবাকও হন নি। অধিকার আর সাহস না থাকার জন্যে শুধু বলেছিলেন, 'ওদের বাড়ির কেউ আসে না?'

'আসে এক-আধ দিন; আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।'

'ওর বউ?'

'জানি না। দেখি নি।'

রিকশা এসে বাড়ির সামনে থামল। নামল সরসী। রিকশাঅলাকে পয়সা মিটিয়ে সদরে গিয়ে দাঁড়াল।

রাত হয়ে আসছিল বলে সরসী আর জিরোতে বসল না। মাসি তার ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসে বসে কি একটা কাজ করছিল। সরসীর গলা পেয়ে জিজ্ঞেস করল যে, বৃষ্টিতে ভিজেছে কি না? সরসী না বলল।

অফিসের কাপড়টা ছেড়ে সরসী সোজা বাথরুমে চলে গেল। ফিরে এসে কাপড়চোপড় গুছিয়ে পরছে; আবার বৃষ্টি নামল। খুব জোরে নয়, তবু শব্দ শুনে বোঝা গেল আস্তেও নামে নি। দরজা জানলা-বন্ধ। সামান্য ফাঁক দিয়েও বাতাস আসছিল। এদিককার বৃষ্টি দেখতে বেশ লাগে, চারদিকে সাদা করে বৃষ্টি নামে, বাতাসের ঝাপটায় জলের ধারা দুলে দুলে ওঠে চিকের মতন। এখন অন্ধকারে বৃষ্টি দেখার কিছু নেই।

মুখ মুছে চুলটা গুছিয়ে নিল সরসী। কয়েক মুঠো পাউডার গলায় ঘাড়ে দিল, বুকের মধ্যে ফেলে রাখল।

কি হবে রাত করে? আলো কখন আসবে কেউ জানে না।

মাসির ঘরে যেতে যেতে সরসী বলল, "দুর্গাদি, খেতে দাও।"

মায়ালতার হাতের কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। এই বয়েসেও ছুঁচের কাজে তাঁর নিপুণতা দেখার মতন। লণ্ঠন জ্বালিয়ে ছুঁচের কাজ করছেন দেখলে সরসী বকবে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে ফেললেন।

সরসী বলল, "কি করছ?"

মায়ালতা বললেন, "একটু সেলাই করছিলাম।...আর একটু পরে ফিরলে বৃষ্টিতে ভিজে মরতিস। এদিকে দুপুরে খুব বৃষ্টি হয়েছে, সন্ধ্যের মুখেও।"

"কলকাতাতেও সারাদিন জল। তবে জোরে হয় নি...।"

"ভাবনা হচ্ছিল। বর্ষার দিনে রাত করিস না।..."

সরসী কোনো জবাব দিল না। ছোট করে হাই তুলল।

সাংসারিক কিছু কথাবার্তা, এলোমেলো দু' পাঁচটা কথা। মায়ালতা লণ্ঠনের পলতে একটু কমিয়ে দিলেন, কাচে কালির দাগ ধরছিল।

দুর্গা খেতে দিয়ে ডাকল।

খেতে বসে সরসী বলল, "মাসি, বাবা মারা গেছে কত বছর হল?"

প্রশ্নটা এমন আচমকা যে মায়ালতা চট করে কিছু বুঝলেন না, জবাব দিতেও পারলেন না। বললেন, "কেন?"

"আমার সাল তারিখ মনে থাকে না। হিসেব করতে ভুল হয়।"

মায়ালতা হিসেব করে বললেন, "বছর ষোলো হল।"

"কানু তো বছর দুই পরেই গেল।"

কানু সরসীর ভাই। ছোট। মায়ালতা মাথা নাড়লেন। তারপর কি ভেবে বললেন, "এবার আমি যাব।"

"তুমি?...তুমি অনেকদিন বাঁচবে।"

"বলিস না। আর আমার বেঁচে থেকে কি হবে?"

সরসী খেতে খেতে মুখ তুলল। মাসি পাশেই। আসনে বসে আছে। খাবার আনছে দুর্গাদি।

"বাঃ, আমি তা হলে একলা থাকব নাকি?" সরসী ছেলেমানুষের মতন হেসে বলল, "তোমায় আমি থুত্থুড়ে বুড়ি হওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখব।"

মায়ালতা দুঃখে সুখে মেশানো কেমন বিচিত্র এক মুখ করে হাসলেন, শব্দ হল না, বললেন, "তুই তো রাখবি, কিন্তু আমি যে দুঃখে মরব।"

"দুঃখ! রাখো তোমার দুঃখ! আমরা কত সুখেই থাকলাম যে দুঃখে মরে যাব! ওসব সয়ে গেছে আমাদের।"

মায়ালতা চুপ করে থাকলেন।

দুর্গা খাবার এনেছিল মায়ালতার। খেতে বসে তিনি লক্ষ করলেন, সরসী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কি ভাবছে কে জানে! হয়ত নিজেদের দুঃখ শোকের

কথা। মাঝে মাঝে তাঁরও মনে হয়, যতদিন তিনি আছেন ততদিন মেয়েটার অন্তত একজন আছে, যে জন্ম থেকে তার গায়ে গায়ে থাকল; যখন তিনি থাকবেন না তখন ওই মেয়ের আর কে থাকবে! সংসারে একেবারে একা।

সরসী আগে আগেই উঠে পড়ল। মুখটুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকছে এমন সময় আলো এল। পাশের ঘরে আর বারান্দায় সুইচ দেওয়া ছিল, দপ করে আলো জ্বলে উঠল। চোখে একটু লাগল সরসীর। আজ আলো না এলেও তাদের বিশেষ ক্ষতি ছিল না; সংসারের কাজকর্ম সবই শেষ হয়ে এসেছে—আর যা বৃষ্টি তাতে গরমও লাগছে না, বরং গা শিরশির করছে।

পাশের ঘরের বাতি নেবাবার আগে দরজা-জানলা সব ভাল করে দেখল। দরজার তলা দিয়ে ব্যালকনির দিকের জল এসেছে খানিকটা, করার কিছু নেই. সরসীর ঘরেও দরজার গোড়ায় জল ঢোকে, জোর বৃষ্টিতে ঘর ভেসে যায় জল ঢুকে. ময়লা কাপড়-চোপড়, চটের বস্তা দিয়ে রাখতে হয় দরজার ফাঁকে।

নিজের ঘরে এসে বাতি জ্বালল সরসী। একটু মশলা মুখে দিল।

বিছানার ওপর বসে থাকল চুপ করে। অন্যমনস্কভাবে এপাশ ওপাশ তাকাল, জামাকাপড় রাখার আলনার দিকে, আলমারির দিকে, কখনো বা দেওয়াল-তাকের দিকে। এই ঘরটা ছিল মামার বাইরের ঘর; পাশের ঘরে মামা থাকত। আর সরসী আর মাসি থাকত মাসির ঘরে। মামা মারা যাবার পর সরসী মামার শোবার ঘরটা নিজে ঘর করে নিয়েছিল। এখন আবার, আজ কিছুদিন সে এই ঘরটা নিজের শোবার ঘর করেছে, পাশের ঘরটা ফাঁকা রেখেছে। যতির জন্যে ঘর ফাঁকা করে রেখেছে বললে ভুল হবে। যতির জন্যে খানিকটা, বাকিটা নিজের জন্যে। একই ঘরে থাকতে থাকতে তার কেমন যেন ক্লান্তি ধরে গিয়েছিল, কিংবা নিতান্তই খেয়াল হল এ ঘরে আসার, পাশের ঘরের বিছানা ঘেঁষে বড় বড় জানালাগুলো খোলা থাকলে রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে সরসীর কেমন ভয় ভয় করত। ভূতের নয়, চোরেরও নয়। জানালা দিয়ে তাকালে শুধু মাঠ আর মাঠ, কখনো অন্ধকারে ডুবে আছে, কখনো জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম করছে। অতটা ফাঁকা, নিঃসাড়, নিঃঝুম ভাব তার সহ্য হত না। মনে হত, সরসীর আশেপাশে যেন কিছু নেই।

বাইরে গেল সরসী। মাসির খাওয়া শেষ হয়েছে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে মাসিকে কিছু বলল, তারপর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করল।

মশারি টাঙিয়ে, পাখাটাকে একেবারে আস্তে আস্তে চালিয়ে বাতি নেবাল সরসী। শুয়ে পড়ল। বাইরে বৃষ্টি, এক-আধবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, ব্যাঙ আর ঝিঁঝির ডাক যেন সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চোখ বুজলেও যতি, না বুজলেও যতি। শুধু যতি নয়—তার সঙ্গে নিজেরাও। এ যেন পাশাপাশি মিশে আছে, একটার সঙ্গে অন্যটা! অবশ্য

শেরপুর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যতি, তারপর আর যতি কোথায়?

সরসী কিছুক্ষণ চোখ খুলে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল, তারপর পাতা বুজে পাশ ফিরে শুলো।

যতিরা যদি ওই রকম করে পেছনে না লাগত তা হলে হয়ত বাবা শেরপুর ছাড়ত না। একে মা'র ওই অবস্থা, মাসিকে নিয়ে অশান্তি, বাবার নিজের চাকরি টিকিয়ে রাখা মুশকিল, চোর জোচ্চোর দুর্নাম রটেছে, তার ওপর যতিদের নোঙরামি। তিক্তবিরক্ত হয়ে বাবা শেরপুর ছাড়ল। নিজের পৈতৃক ভিটে ছাড়ার ঘা মা'র সহ্য হল না, মারা গেল। বাবাও শেরপুর ছেড়ে এসে অন্ধের মত হাতড়াতে লাগল যদি কোন পথ পায়, কেমন করে এই সংসার বাঁচিয়ে রাখবে! বাড়ি বিক্রীর টাকার খানিকটা গিয়েছিল শেরপুরেই, ধারকর্জ মেটাতে, বন্ধকী ছাড়াতে, মামলা মোকদ্দমার মিটমাটে। বাকি টাকায় কৃপণের মতন তাদের চলতে হয়েছে। বড় দৈন্য আর কষ্টে কেটেছে সরসীদের। এতদিন পরে সেসব কথা ভাবলে মাঝে মাঝে মনে হয়, ভগবান যদি বাঁচিয়ে না রাখতেন সরসীকে বেঁচে থাকতে হত না।

শেরপুরে থাকতে পারলে বাবার পক্ষে ধাক্কাটা সামাল দেওয়া অনেক সহজ হতে পারত, হয়ত পরিশ্রম করে বাবা আবার খানিকটা মাথা তুলতে পারত। শেরপুর ছেড়ে এসে অজানা অচেনা জায়গায় বাবা কোনো কূল পেল না, সমুদ্রে সাঁতার কাটার মতন হাত পা ছুঁড়তে লাগল, গিয়েছিল সাসারাম একটা কাজের ব্যাপারে। সেখানে খুন হল।

এই সময় মাসি মেসোমশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ না করে পারল না। বাবার সঙ্গে মেসোমশাইয়ের ক্ষীণ যোগাযোগ বরাবরই ছিল। বাবা বোধ হয় সব সময়ই ভেবেছে, তাঁর কিছু অপরাধ থেকে গেছে মেসোমশাইয়ের কাছে। মাসির এবং সংসারের খবরাখবর জেনে মেসোমশাই তাদের নিজের কাছে ডেকে নিল। তখন মেসোমশাই কলকাতায়; হাতিবাগানে কাপড়ের ছোটখাট দোকান চালান। গলায় কণ্ঠি। মাছমাংস খান না। নবদ্বীপে কোনো বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষিত। অবস্থা ভাল ছিল না মেসোমশাইয়ের, কোনো রকমে চলত। মাথা গোঁজার আশ্রয় পেয়ে সরসীরা বাঁচল।

যতদিন মেসোমশাই বেঁচে ছিলেন সরসী তাঁর স্নেহ পেয়েছে। আর তাঁকে দেখে দেখে শিখেছে, মানুষ কত উদাসীন অথচ নম্র, নিরাসক্ত অথচ মমতাময় হয়। মাসি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে, তাঁকে ফেলে রেখে নিজের সুখ খুঁজতে গিয়েছিল বলে কোনো রাগ, অভিযোগ, ঘৃণা তিনি রাখেন নি। মাসি ফিরে আসায় তিনি যে আহ্লাদে ডুবে গিয়েছিলেন তাও নয়। সমস্তটাই যেন তিনি কর্তব্যের অংশ বলে গ্রহণ করেছিলেন, উপায়হীনা অসহায়দের আশ্রয় দেওয়া তাঁর উচিত বলে মনে হয়েছিল, তিনি শান্ত ও

শিষ্ট ভাবেই আশ্রয় দিয়েছিলেন। ধর্মভীরু, ভক্ত, নিরভিমানী এই মানুষটি সরসীকে কোথায় যেন বড় একটা আশ্বাস দিয়ে একদিন শীতের ভোরে চলে গেলেন।

মাসি সেদিন স্বামীর জন্যে এমন করে কেঁদেছিল—মনে হচ্ছিল কোনো পশু যেন মাথা খুঁড়ে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদছে।

৬

বৃষ্টি থামল না। আকাশে লেগে রইল। আসে যায়; মেঘলা জড়িয়ে থাকে দিনের আলোয়; হয়ত ভোরের দিকে ঘুম থেকে উঠে চোখে পড়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে, দুপুরে মনে হয় আকাশটা পরিষ্কার হবে, আলো আলো ভাব হয়, আবাব কখন আকাশ জুড়ে মেঘ জুটে যায়। এই করে তিনটে দিন কেটে গেল। কাগজে বলছে, বর্ষার প্রথম পালা আরও কিছুদিন থাকবে।

যতিকিশোর এসেছিল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে; পরের দিনও সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি। জলে জলে মাঠঘাট একাকার। সামনের মাঠে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বর্ষার শুরু থেকেই মাঠেব রঙ সবুজ হয়ে আসছিল, কি তাড়াতাড়ি ঘাসগুলো বেড়ে যাচ্ছে।

সবসীই এই একঘেয়ে বাদলায় ঘিনঘিন করছিল। যতিকিশোর কোনো অসুবিধে বোধ করছিল না। তার ভাল লাগছিল। কি যায় আসে বৃষ্টিতে, হাতের সামনে একটা ছুটির সোমবার পড়ে আছে।

সারা সকাল ধরে যতিকিশোর একটা হেড্‌লি চেজ শেষ করল শুয়ে বসে। তারপর বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে সরসীর তাগাদায় দাড়ি কামাতে বসল।

সরসী এক কাপ চা এনে দিল। বলল, "কি একগাদা বই এনেছ? মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাক?"

যতিকিশোর হাসি মুখে বলল, "সময় কাটাবার পক্ষে ভাল জিনিস।... হাসপাতালে থাকার সময় বর্কাস নেশাটা ধরিয়ে দিয়েছিল।"

"আর কোনো নেশা ছিল না?"

যতিকিশোর চায়ের কাপ মুখে তুলে বলল, "আর যা ধরেছে সেটা তো তুমি ধরিয়েছ।" বলে যতিকিশোর হাসল।

সরসী চোখের কেমন একটা মেয়েলী ভাব করল, যেন বলল, ও তাই নাকি?

যতিকিশোর কয়েক চুমুক চা খেয়ে আয়নায় মুখটা দেখছিল। আয়নাটা সরসী আনিয়ে রেখেছে যতিকিশোরের জন্যে। এ বাড়িতে এখন তার জন্যে

টুকরো টুকরো জিনিস জমে যাচ্ছে, কোনোটা সরসী কিনে আনছে, কোনোটা যতিকিশোর নিজেই। তার দু' চারটে জামা-প্যাণ্ট পাজামা জমে গেছে এখানে, এক জোড়া চটি জুটেছে দুটো তোয়ালে, দাড়ি কামাবার সকল রকম সরঞ্জাম, অ্যাসট্রে, আরও টুকিটাকি।

মোড়ার ওপর বসেছিল সরসী, পিঠ নুইয়ে। যতিকিশোর আঙুল দিয়ে গালের চামড়া পরখ করছিল। পাশে দাড়ি কামাবার সব রকম ব্যবস্থা, ব্রাশটা জলের মধ্যে ডোবানো। চা খেয়ে দাড়ি কামাতে বসবে যতিকিশোর।

হঠাৎ সরসী বলল, "তোমার বাড়িতে কিছু বলছে না?"

বাড়ি অর্থে বউ, মীনা। যতিকিশোর লক্ষ করে দেখেছে, সরসী খুব কমই বউ ব'লে কথা বলে, তার বদলে বলে বাড়ি।

যতিকিশোর বলল, "তেমন কিছু না।"

সরসী তাকিয়ে থাকল। যতিকিশোর তার পারিবারিক জীবনের অনেকটাই বলেছে সরসীকে, সে মোটামুটি যতি আর যতির বউয়ের সম্পর্কটা বুঝতে পারে, যদি না বুঝত তাহলে এমন করে তাকে এ বাড়িতে টেনে আনত না। বাধত। কিন্তু যতিকিশোর বার বার বাড়ি ছেড়ে চলে আসছে, থাকছে এখানে, তার বউ কি কিছুই বলছে না, বুঝছে না?

সরসী বলল, "তুমি কিছু জানিয়ে আস না?"

"না," মাথা নাড়ল যতিকিশোর। একটু থেমে বলল, "মধ্যিখানে তো ও কলকাতায় ছিল না। দার্জিলিঙ থেকে ফিরেছে সপ্তাহখানেক।"

সরসী চুপচাপ থাকল।

চা শেষ করে যতিকিশোর দাড়ি কামাতে বসল। গালে সাবানের ফেনা তুলতে তুলতে বলল, "মীনা ধরে নিয়েছে আমি খিদিরপুরে যাই, মা-বাবার কাছে। ও-বাড়িতে আমার আসা-যাওয়া বাড়ছে বলেই ওর ধারণা।"

সরসী কোলের কাছে কাপড়টা ঠিক করল। কাল রাত্রে ডান হাতের কনুইয়ের তলায় লণ্ঠনের ছেঁকা খেয়েছে, ফোস্কা পড়ে গেছে। ফোস্কাটা দেখা যাচ্ছিল। সরসী অন্যমনস্কভাবে বলল, "তুমি খিদিরপুরে যাও না?"

"গিয়েছিলুম একদিন।"

"মতির বউ ভাল আছে?"

"হাঁটাচলা করছে দেখলাম।"

"জ্যাঠামশাই কেমন আছে?"

"বাবাকে তো ওপর ওপর ভালই দেখলাম। একটা ছানি কাটাবার তোড়-জোড় করছেন, বোধ হয় পুজোর আগেই কাটিয়ে ফেলবেন।"

সরসী স্নানে যাবে। পিঠের চুল বুকের কাছে টেনে নিয়ে আঙুল দিয়ে আঁচড়াতে লাগল।

যতিকিশোর ব্রাশ রেখে সেফটি রেজার তুলে নিয়ে বলল, "হাসি শুনলাম—বাইরে যাবার চেষ্টা করছে।"

"বাইরে?"

"আমেরিকা ট্যামেরিকা হবে।...আজকাল পড়াশোনার নাম করে বাইরে যাবার হিড়িক খুব।"

"পারবে ও থাকতে?"

"জানি না। আগে যাবার ব্যবস্থা পাকা হোক...। হাসির ব্যাপার আমি বুঝতে পারি না। ওর সবই নিজের মধ্যে।...বিয়েটিয়ে হল না যখন, হবে বলেও মনে হচ্ছে না—নিজেই আর করবে না বলেছে—তখন যেখানে খুশি চলে যাক।"

সরসী আঙুলে চুল জড়িয়ে নিচ্ছিল, উঠে আসা চুল; বলল, "তুমি তোমার বাড়ির সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলো যেন অন্য কারও বাড়ি সম্পর্কে বলছ।"

যতিকিশোর জুলফির কাছে রেজার ঠেকিয়ে বলল, "আমার বাড়ি তো সত্যিই আমার নয়।"

সরসী আর বসল না, উঠে গেল।

দাড়ি কামাতে কামাতে যতিকিশোর এলোমেলোভাবে বাড়ির কথা ভাবল। বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক যে তৃতীয় ব্যক্তির মতন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেককাল আগেই এটা ঘটে গেছে, সম্পর্ক ভেঙে গেছে। যতিকিশোরই ভেঙে ফেলেছিল। পুরোপুরি। একটা সময় গিয়েছে যখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যতিকিশোর বাড়ির কোনো খোঁজখবর রাখত না। বাবা, মা, মতি, হাসির কারুরই প্রায় নয়। খুব ক্ষীণ একটা যোগাযোগ ছিল। বাড়িও তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, যতিকিশোরকে কারও প্রয়োজন হত না। অনেক পরে যতি-কিশোর আবার নিয়মরক্ষার মতন বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করল। এখনও মোটামুটি সেইরকম রয়েছে, কোনো আন্তরিক সম্পর্ক নয়, নেহাতই সামাজিক, মৌখিক। তবে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর সে আজকাল মাঝে মাঝে, কখনোসখনো খিদিরপুরে মা-বাবার খোঁজখবর করতে যায়। যতিকিশোর লক্ষ করে দেখেছে সে বাড়িতে গেলে কারও কোনো উৎসাহ আসে না, বাইরের লোককে যেভাবে মানুষ গ্রহণ করে অনেকটা সেইভাবে সৌজন্য দিয়ে তাকে গ্রহণ করা হয়। এক মাকে দেখলে মনে হয়, যতিকিশোরের জন্যে বোধ হয় মা'র এখনও কিছু স্নেহমায়া থেকে গেছে। যাকগে, যতিকিশোর নিজেও বাড়ির কাছে কিছু চায় না; সে জানে তার কোনো সঙ্গত অধিকার বাড়ির ওপর নেই। তাছাড়া যতিকিশোর সন্দেহ করে, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করলে, বেশী যাতায়াত শুরু করলে মতি আর হাসি ভাববে, দাদা খিদিরপুরের বাড়ির জন্যে বাবা-মা'র নজরে আসার চেষ্টা করছে। যতিকিশোরের সে-লোভ নেই, আগ্রহও নেই।

যদিও যতিকিশোর অনেক আগেই বাড়ির বাইরে চলে এসেছিল, তবু সম্পর্ক একেবারে ভেঙে দেয় নি। বাবা তখনও শেরপুর ছেড়ে চলে আসেন নি; আসব আসব ভাবছিলেন। খিদিরপুরে সবেমাত্র জমিটা কিনেছেন কোন্ বন্ধুর পরামর্শে। যতিকিশোর তখন কলকাতায়। চিঠিতে একটা যে যোগাযোগ ছিল। তারপর বাবা, কলকাতায় এসে বাড়িতে হাত দেন। তখনই যতিকিশোর মীনাকে বিয়ে করে। বাবা, মা, মতি, হাসি কেউই মীনাকে পছন্দ করে নি, মীনাও শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে দেখে ঘেন্নায় বিরক্তিতে নাক কুঁচকে ছিল। তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, সমস্ত বাড়িটাই চাষাভুষো গোছের লোকেদের আস্তানা, কোথাকার কোন্ বেহারী মফস্বল শহরের ভূত, সভ্যতা ভব্যতা জানে না, শহুরে চালচলন শেখে নি, রোজ সকালে কোন নারায়ণের সামনে জল বাতাসা দাও, শ্বশুরের সামনে মাথায় কাপড় তোলো, শাঁখা পরা হাতে, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর দাও...। মীনা সরাসরি সব অগ্রাহ্য করল। অবশ্য, যতিকিশোর বিয়ে করে বউ নিয়ে বাবা-মা'র কাছে থাকবে এমন ভাবে নি, তার সে উদ্দেশ্যও ছিল না, বরং মীনাক বিয়ে করার আগেই তাকে বলে নিতে হয়েছিল সে আলাদাভাবে থাকবে। ফ্ল্যাট নেওয়াও হয়ে গিয়েছিল। তবু মানুষের একটা চক্ষুলজ্জা বলে জিনিস আছে। তার বাবা-মা ভাইবোন কলকাতায়, বিয়ে করে বউ নিয়ে রাতারাতি সে নিজের ফ্ল্যাট বাড়িতে চলে আসে কি করে?

দিন পনেরোও থাকতে পারে নি যতিকিশোর। মীনা প্রথম দিন থেকেই পা তুলে রেখেছিল। রোজই অশান্তি। মীনা প্রথম থেকেই অগ্রাহ্য এবং উপেক্ষার ভাব দেখাতে লাগল, যেন সে ওই বাড়ি, বাড়ির লোক কাউকেই গ্রাহ্য করে না। অপ্রিয় ঘটনাও ঘটাল বার কয়েক। মতি এবং হাসির সঙ্গেও তার বনলো না। তারাও মীনাকে পছন্দ করে নি। হাসির সঙ্গে ঝগড়াও হয়ে গেল দু-একদিন। মা-বাবা চাইছিলেন, যতি তার বউ নিয়ে নিজের জায়গায় চলে যাক্। মা-বাবার কোনো দোষ ছিল না: কেননা ছেলের সঙ্গেই তাঁদের সম্পর্ক যখন উঠে যাবার মতন, বিয়ে বউ সবই ছেলের মরজিতে, আলাদা থাকার জন্যে বাড়ি নেওয়াও হয়ে গিয়েছে যতির—তখন কেন আর এই অশান্তি!

যতিকিশোর চক্ষুলজ্জা বাঁচাতে বউ নিয়ে মা-বাবার কাছে কয়েকটা দিন ছিল, অন্য কোনো টান বা ইচ্ছে তার ছিল না। সে আর দেরী করে নি; নিজেদের ফ্ল্যাটে চলে এল। অবশ্য এই ব্যাপারটা তার ভাল লাগে নি, দশ-পনরোটা দিন মীনা কোনোরকমে শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ননদকে সয়ে গেলে পারত। যতি-কিশোরের খানিকটা লেগেছিল, হাজার হোক তারই মা-বাবা ভাইবোন, মীনার অবজ্ঞা তার পারিবারিক অভিমানে লেগেছিল।

দাড়ি কামানো শেষ হল যতিকিশোরের। কানের পাশে, থুতনির তলায় গলার কাছে সাবানের শুকনো দাগ ছিল। মুছে ফেলল।

মায়ালতা কিছু বলছিলেন। দুর্গার সঙ্গে। কি বলছিলেন যতিকিশোর শুনতে পেল না, বাইরের দরজার দিকে তাকাল। আবার বৃষ্টি এসে গেল।

যতিকিশোর দাড়ি কামানোর জিনিসগুলো নিয়ে উঠে পড়ল। নিজের হাতে কাজ করার অভ্যেস তার আজকাল চলে গেছে। বাড়িতে এসব কাজ বিষ্টুর। এখানে এই তুচ্ছ কাজগুলো করতে যতিকিশোরের ভালোই লাগে।

ভেতরের বারান্দায় এক কোণে একটা ছোট বেসিন আছে, কল না থাকার জন্যে পাশে একটা জলভরা বালতি আর মগ থাকে, হাতটাত ধোয়ার কাজগুলো অনায়াসেই সারা যায়। স্নানের ঘর নীচে, স্নান আর রান্নার। রাত্রে ব্যবহারের জন্যে ছোট্ট একটা বাথরুম অবশ্য আছে। জল তোলাতুলির হাঙ্গামার জন্যে দিনে সেটা ব্যবহার করা হয় না।

ঘরে ফিরে এসে যতিকিশোর আয়না, ব্রাশ, রেজারটেজার সব গুছিয়ে রাখল। খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টি দেখা যাচ্ছিল, পাতলা বৃষ্টি। জানালার শার্সিগুলো প্রায় সবই বন্ধ। দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যতিকিশোর অন্যমনস্কভাবে বৃষ্টি দেখতে লাগল। সরসী স্নান সেরে ফিরে এলে সে স্নানে যাবে। স্নানে গিয়ে দেখবে—বাথরুম পরিষ্কার, কোথাও একটু জল দাঁড়িয়ে নেই, সরসী ঝেঁটা দিয়ে মেঝেব জল সরিয়ে দিয়েছে, জলে যতিকিশোরের পা পিছলে যেতে পারে, পিছলে গেলে পেটে লাগবে এই খেয়াল তার আছে। টানা বর্ষা চলছে বলে যতিকিশোরের জন্যে আধ বালতি গরম জলও সাজানো থাকবে যে তাতেও সন্দেহ নেই।

সরসীর যত্ন ও সেবার ওপর যতিকিশোরের লোভ পড়ে যাচ্ছে হয়ত। কখনো কখনো লজ্জাই করে তার। এমন কোনো অধিকার তার নেই সরসীর ওপর যাতে সে এইসব সাংসারিক ছোটখাট সেবাযত্ন পেতে পারে।

যতিকিশোর ছেলেমানুষ নয়, নির্বোধও নয়। তাদের মতন মানুষ যাকে সেবাযত্ন আদর বলে তা আর কিছু নয়, সাধারণ জীবনের কিছু উষ্ণতা অনুভব করা। বোধ হয় এটা এই যে, যতিকিশোরের ওপর সরসীর মনোযোগ রয়েছে তা বোঝা এবং অনুভব করা। ছেলেবেলায় স্কুল যাবার সময় যতিকিশোর কাকস্নান সেরে কোনো রকমে দুটো মুখে গুঁজে ছুটত বলে মা মাঝে মাঝেই ছেলেব হাত ধরে কলতলায় টেনে নিয়ে গিয়ে সাবান আর ধুঁধুলের ছোবড়া দিয়ে স্নান করিয়ে দিত। যতিকিশোর ঠিক মতন খাচ্ছে না বুঝে মা নিজের হাতে করে ছেলেকে খাইয়ে দিতেন। দু-চারটে চড়চাপড় যে স্নান ও আহারের মধ্যে পড়ত না তা নয়। কিন্তু এই তুচ্ছ কাজগুলো নিশ্চয় বোঝাতে চাইত, ছেলের ওপর মা'র দৃষ্টি ও মনোযোগ রয়েছে। এর কোনো মূল্য আছে কিনা যতিকিশোর জানে না; তবে এই মনোযোগটুকু ভাল লাগে।

মীনার সঙ্গে সংসার করার পর যতিকিশোর বুঝতে পেরেছে মীনা এ

ধরনের কোনো মনোযোগ সাংসারিক জীবনে দিতে চায় না। সে অভ্যেস তার নেই। শিক্ষাও নয়। আসলে মীনা সেই জাতের, বা সেই ধরনের মেয়ে যার কাছে স্বামী খানিকটা প্রয়োজন খানিকটা বা অভ্যাসের বস্তু। দোষ মীনার নয়, কেননা মীনা যতিকিশোরের কাছে স্বেচ্ছায় ছুটে আসে নি। যতিকিশোর নিজেই মীনার কাছে ছুটোছুটি করেছে। আর এটাও ঠিক, প্রেম ভালবাসা আকর্ষণের ব্যাপার সেখানে প্রায় ছিলই না, যতিকিশোর মীনাকে কোনো রকমে নিজের মুঠোয় ধরতে চেয়েছিল। নিজের উচ্চাশা, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পূরণের জন্যে মীনাকে বিয়ে করা তার পক্ষে তখন খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। যদি যতিকিশোর মীনাকে জিততে না পারত তা হলে অনিমেষ সোম কিংবা টি টি তাকে জিতে নিত। সোম, টি টি আর যতিকিশোরের মধ্যে তখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। যেন তিনজনেই ঘোড়ার পিঠে জকির মতন চেপে প্রাণপণে চেষ্টা করছে কে কার আগে শেষ সীমাটা ছুঁতে পারে। সোম অকারণ ছুটছিল, তার কোনো দরকার ছিল না দৌড় মারার, বাপ পিতামহের দৌলতে তার কলকাতায় বাড়ি, নিউ মার্কেটে ফুল, গারমেণ্টস্ আর ক্রকারির দোকান। তিন-চারটে ভাই তার সম্পত্তির শরিক অবশ্য, কিন্তু তুই কেন ছুটছিস? তোর কি দরকার? তুই তো আর ওয়ারেন অ্যান্ড কুপার্সের চাকরে নয়, জুনিয়ার থেকে সিনিয়ার অফিসার হবার জন্যে আদা জল খেয়ে লাগিস নি। সোমকে তার ঘোড়া নিয়ে পিছিয়ে পড়তে হল দুটো কারণে। এক, সোম দেখতে অনেকটা ভোঁদড় টাইপের ছিল, গায়ের রঙটা বড়ই কালচে, থলথলে মাংস আর চর্বির ডিপোজিট, গোঁফ রেখেছিল সেকেলে বনেদী বেনেদের মতন। তবে হ্যাঁ, লোকটা খারাপ ছিল না। চেহারার জন্যে প্রথম ঘা খেল সোম, দু' নম্বর ঘা খেল তার বিদ্যে তাকে কলকাতার বি-এ'টাও দেয় নি।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলে জমল টি টি-র সঙ্গে। টি টি-র চেহারা ছিল খাসা... দার্জিলিং থেকে নেমে এসেছিল কলকাতায়, বলিয়ে-কইয়ে ছেলে, প্রচন্ড একরোখা, মেয়েদের গলায় যে কোনো সময়ে ঝুলে যেতে পারে। যতিকিশোর টি টি-র সঙ্গে লড়তে নেমে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে তার ঘাম ছুটে যেত, এটাও বুঝতে পারত টি টি মীনাকে প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলেছে। টি টি-ও ডবলু অ্যান্ড পি-এর সিনিয়ার অ্যাসিসটেণ্ট ছিল। তারও আশা ছিল চূড়ায় উঠবে, সিঁড়ি খুঁজছিল। যতিকিশোর দেখল, দুটো ঘোড়াই যখন গলায় গলায় ছুটেছে, বরং টি টি এগিয়েই যাচ্ছে, তখন যতিকিশোর একটা বেআইনী কাজ করল। টি টি-র ঘোড়াকে মুখ থুবড়ে ফেলে দিল। এটা করতে যতিকিশোরকে প্রচন্ড রকম বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছিল, সূক্ষ্ম কলাকৌশল দেখাতে হয়েছিল। টি টি একেবারে মুখ থুবড়ে হাঁটু ভেঙে পড়ল, তার আর সাধ্য হল না মীনার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মীনার বাবা

ডবলু অ্যান্ড পি-এর সলিসিটার, তাঁর ফার্মের প্রচণ্ড নামডাক, 'ডবলু অ্যান্ড পি' মীনার বাবার হাতে ধরা পুতুল। খাতির ছিল খুব; ডিরেক্টর বোর্ডের দুজন তো তাঁর গেলাসের বন্ধু।

মীনাকে যতিকিশোর তখন যা তোয়াজ করেছে সে এক যতিকিশোরই জানে। মীনাও জানে। যাকে বলে, পায়ের তলায় বুক বিছিয়ে দেওয়া। মীনার পায়ের তলায় সেইরকম বিছিয়ে দিয়েছিল নিজেকে যতিকিশোর, তা ছাড়া যতিকিশোর যে-ধরনের বেপরোয়া হতে পারত তখন তাতে অসাধ্য বলে কিছু না থাকারই কথা।

মীনা বা বলা যাক মীনার পরিবারের সঙ্গে তখন একটা সোজাসুজি শর্ত হয়ে গিয়েছিল। শর্তটা এই, যতিকিশোরদের কোনো মর্যাদা নেই, মানে শেরপুর দেখিয়ে কলকাতায় চলবে না। বড় পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছ যখন তখন তাকে 'স্ট্যাটাস' রেখে ভরণপোষণ করাতে হবে, আলাদা বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া কর, ঘরদোর গুছোও, একটা মোটামুটি গাড়ির ব্যবস্থা করো ইত্যাদি ইত্যাদি।

যতিকিশোর শর্ত পূরণ করতে অরাজী হল না। মীনাও তার গলায় বরমাল্য দিল।

এদিক থেকে যতিকিশোর বলতে পারবে না, মীনা কোনো অন্যায় করেছে। সে আগেভাগেই যা বলে নিয়েছিল সেইভাবেই চলছে। তবু বিয়ের আগে এবং পরে কি এক হওয়া উচিত? না মানুষ সেভাবে থাকতে পারে? বিয়ের পর যতিকিশোর মীনাকে নিয়ে কিছুদিন বেশ নাচল। যেমনটি মীনা চায়, যাতে সে অভ্যস্ত যতিকিশোর তাতেই সায় দিয়ে মীনার সঙ্গে ছোটাছুটি করল। মীনার বাপের বাড়িতে সে বাধ্য অনুগত হয়ে যেত-আসত, টেবিলে বসত, মীনার কোন্ কোন্ আত্মীয় লন্ডন, গ্লাসগো, কানাডায় আছে তাদের নাম ও বংশতালিকা মুখস্থ করত, সেনবাড়ির যে মোকদ্দমা নিয়ে কলকাতায় কাগজে কাগজে কেচ্ছা রটছে তার আলোচনা করত, এবার পুজোয় গোপালপুর যাবে না সিমলা, তাই নিয়ে বৈঠক করত, দেশটা কি ধরনের হ্যাগার্ডস আর বেগারসে ভারে যাচ্ছে সে-বিষয় নিয়ে বড় বড় কথা বলত, এই ডেমোক্রাসি একেবারে রাস্তার লোককে মাথায় বসিয়ে দিয়েছে, এখানে একটা মিলিটারি রুল চাই, চাবুকে চাবুকে সব সায়েস্তা করে দেবে—এই ধরনের আলোচনায় মাতব্বরদের মতন ঘাড় নাড়ত। অ্যাসেম্বলি আর পার্লামেণ্টের চরিত্র কিভাবে বদলে যাচ্ছে, যত এলেবেলে লোক ভোট জিতে ঢুকে পড়ছে—কথা বলতেও জানে না, এরা কি করবে, কি জানে, ঘোড়ার পাতার বিদ্যে নিয়ে এম-এল-এ?

যতিকিশোর বেশ বুঝতে পারল সে ভাঁড় হয়ে যাচ্ছে। মীনা তাকে চতুষ্পদ জন্তুর মতন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; আর মীনা যতিকিশোরের

পিঠে চেপে বসে আছে চুলের মুঠি ধরে। তুলোর বালিশ দিয়ে যতিকিশোরের ঘাড়ে পিঠে পাছায় মারছে!

বাঃ, বাঃ যতিকিশোর! চমৎকার! খাসা জীবন তোমার! ভাল ফ্ল্যাট, এক জোড়া দাসদাসী, হরেক রকম আসবাবপত্র, স্পঞ্জের গদিঅলা বিছানায় শোও, টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট করো, তোমার বউ চোখ রগড়াতে রগড়াতে স্বল্পবাস হয়ে মুখোমুখি বসে থাকে, তোমার নামে হরদম বিল আসছে, ব্যাংকের জমানো টাকা শেষ হয়ে গেল, তোমার বউ মাসের আঠাশ দিনে একুশ দিন নিয়মিত পিল খায়, বাকি আঙুলে গোনা ক'টা দিন তুমি পরিত্যক্ত।

যতিকিশোর বেশ বুঝতে পারল, মীনা তার দাম্পত্যজীবন এবং সংসারটাকে এমন বাহারী করেছে যেন সেটা ঘরে সাজানো অ্যাকুইরিয়াম। জল আর আলোর মধ্যে তারা মাছ হয়ে খেলা করছে, বেড়ে দেখতে। সবটাই কৃত্রিম, প্রাণহীন, শৌখিন। এটা কোনো জীবন নয়। মীনা ভেবেছে এই সংসারে তার আর কিছু করার নেই, সে শুধু আছে এই যথেষ্ট।

ঘড়িতে দম দিয়ে দিলে কাঁটা দুটো নির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে যায়—এটা ঠিকই; কিন্তু সংসারকে সেভাবে চালানো যায় না।

যতিকিশোর এবার বেঁকে বসল। আর তখন থেকেই অশান্তি। সেটা বাড়ল —বেড়েই চলল, আরও বাড়ল। এখন যতিকিশোর বা মীনা কেউ কারুর সম্পর্কে তেমন আগ্রহী নয়। একই বাড়িতে আছে এই মাত্র। কে বলবে, মীনা এতোদিনে তার সুবিধে মতন—যেমন দত্ত মজুমদারের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে কি না।

সরসী বারান্দা থেকেই ডেকে বলল, "স্নানে যাও।"

যতিকিশোর দরজার দিকে তাকাল, সরসী নেই। তবু তার মনে হল বারান্দায় দাঁড়িয়ে সরসী তার ভিজে শাড়ি মেলে দিচ্ছে, সরসীর ভিজে চুল পিঠময় ছড়ানো, শাড়িটা আলগোছে পরা, গায়ের জামার হয়ত সব ক'টা হুকও আটকায় নি। সরসীকে যতিকিশোর অনুভব করতে পারছিল।

দুপুর, বিকেল কাটল। মাঝ দুপুরে অল্পের জন্যে আলো আলো ভাব হয়েছিল, বৃষ্টি ছিল না, বিকেলে আবার কালো হয়ে এল চারপাশ। সরসী দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙল বিকেলের শেষদিকে। চোখমুখ ভারী হয়ে গেছে, গলার স্বরও মোটা শোনাচ্ছিল সামান্য। চা করেছিল দুর্গা। চা খেয়ে ঘরের ছোট ছোট কাজকর্ম সারল, যতিকিশোরের ঘরের কোথায় কি এলোমেলো হয়ে আছে গুছিয়ে দিল, বিছানা পরিষ্কার করল, বলল, 'আর বিছানায় শুয়ে বই পড়তে হবে না, সারাদিন শুধু গড়াগড়ি দিচ্ছ।' যতিকিশোর হাসল। সে দুপুরে, এই বাদলার দিনে, কিছুক্ষণ তন্দ্রার ঝোঁকে শুয়েছিল,

ঘুমোয় নি; তারপর আর-একটা হালকা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল—যাকে বলে স্পাই স্টোরি। বর্কাস নেশাটা ধরিয়ে দেবার পর যতিকিশোর দেখেছে, সময় কাটাবার পক্ষে, কিংবা ভাবনা-চিন্তা ভুলে থাকার জন্যে যে কোনো একটা থ্রিলার চমৎকার জিনিস। চৌরঙ্গি থেকে পাঁচ-সাতটা বই একসঙ্গে কিনে নেয় যতিকিশোর।

যতিকিশোরের ঘরে বসেই সরসী গল্প করতে করতে বিকেলের চুল বাঁধল। মায়ালতাও ঘরে এসে খানিকটা সময় কথা বলে গেলেন। খানিকটা পরেই বিকেল ফুরোলো, মেঘের আঁধারে সন্ধ্যে হয়ে এল।

চোখেমুখে জল দিয়ে এসে যতিকিশোর দেখল, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বৃষ্টি আসছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না, বাদলা বাতাস আর জলের গন্ধে অনুভব করা যাচ্ছে দূর থেকে শব্দ ছড়িয়ে বৃষ্টি আসছে।

সরসী এল আরও খানিকটা পরে। ঘরে বাতি জ্বলছে। বৃষ্টির ছাটের জন্যে জানালার শার্সিগুলো বন্ধ।

সরসী হেসে বলল, "তুমি তো আর তেলেভাজা খাবে না, আমরা একটু বেগুনী ফুলুরি খাব। দুর্গাদি ভাজতে বসেছে।" একেবারে ছেলেমানুষীর হাসিখুশী ভাব সরসীর।

যতিকিশোর সকৌতুক চোখে সরসীকে দেখছিল। বিকেলের কাপড় বদলেছে, মুখে পাউডারের পাতলা প্রলেপ। গলায় লকেট ঝোলানো হার পরেছে সরসী। সকাল বা দুপুরে ছিল না, হয়ত এখন শখ করে পরেছে।

যতিকিশোর ঠাট্টা করে বলল, "খাবে তুমি, আমায় শোনাচ্ছ কেন?"

"তোমার লোভটা দেখছি," সরসী চোখ বড় করে হাসতে হাসতে বলল।

যতিকিশোর চোখ সরাল না, মজার গলায় বলল, "দেখো...। তবে একটা কথা মনে রেখো, এককালে তোমায় আমি রামসদয়ের দোকানে অনেক পাকৌড়ি, আলুর চপ খাইয়েছি। তখন তুমি ঝাল লাগলে ফ্রকটা তুলে নিয়ে জিব মুছতে।" বলে যতিকিশোর হাস্যকরভাবে তার জিব বের করে সরসীর জিব মোছার ধরনটা দেখাল।

সরসী হেসে উঠল খিলখিল করে, হাসতে হাসতে দু' পাশে মাথা দোলাল। যেন বোঝাতে চাইল, থাক বাবা, আর তোমায় জিব মোছা দেখাতে হবে না।

হাসি থামলে সরসী বলল, "যাই বলো বাপু, রামসদয়ের মতন ডালের পাকৌড়ি জগতে আর কেউ করতে পারবে না। পারবে?"

হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল যতিকিশোর। জগতের হিসেবটা এত সহজে হবার নয়, ক' হাজার বা ক' লক্ষ লোক পাকৌড়ি ভাজে তাও ভগবান জানেন। তবু রামসদয়কে পয়লা নম্বর করে দিতে তার আপত্তি নেই। শেরপুরে তাদের মহল্লার দিকে যে বাজার ছিল তাকে বলত নীচু বাজার। বেহারীরা বলত

নীচ্‌চা বাজার। বাজারটা বড়ই, কিন্তু তার আশপাশ ঘিরে তমাম এলাকাটারই নাম হয়ে গিয়েছিল নীচু বাজার। আসলে সমস্ত এলাকাটাই ছিল শহরের ঢালের দিকে—নীচু জায়গায়। যতিকিশোরের স্পষ্ট মনে আছে, নীচু বাজারের মাঝামাঝি বাঁ দিকে ছিল সবজি বাজার। সবজি আর মাছ মাংস বিক্রী হত। বাজারের সদর রাস্তা ছেড়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে সবজি বাজারের ভেতর ঢুকত তারা। কোনো পুরোনো বাড়ির বাইরের মহলের মতন বাঁধানো চাতাল, পাশাপাশি ছোট ছোট দোকান ঘর, তারপর ফাঁকা জমি—চালা তুলে দোকান হয়েছে। সবজি বাজারে ঢোকবার মুখে ছিল রামসদয়ের তেলেভাজার দোকান। বিকেলে কী ভীড়! বর্ষার দিনে জলে কাদায় প্যাচপেচে জায়গায় দাঁড়িয়ে যতিকিশোর কত বেগুনী, পাকৌড়ি কিনেছে. সরসীকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, তারপর দুজনেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তেলেভাজা খেতে খেতে ঝালের চোটে জিবের জল টেনেছে।

সরসী জিজ্ঞেস করল, "খাবে নাকি দুটো? আনব?...আমার ভয় হচ্ছিল এসব অখাদ্য তুমি আর খাও না।"

যতিকিশোর গালের কাছটায় চুলকে নিল। "না, আমি এখন নানা সুখাদ্যই খাই—তবে তুমি তোমারটা আনো. আমি দু'একটা নেব।"

"তা হলে বসো একটু, আমি একেবারে চা নিয়ে আসব।"

সরসী চলে গেল। যতিকিশোর যেন মনে মনে শেরপুরের নীচু বাজারের ছবিটা দেখতে লাগল। আড্যিবাবুর মুদির দোকান, হালখাতার দিন শালপাতায় করে টাটকা গজা আর বোঁদে দিতেন বাচ্চাদের, পাশে ছিল রাজাবাবুর বড় স্টেশনারি দোকান, দেওয়ালীর দিন রঙচঙে কাগজের ফুলটুলে চীনে লণ্ঠনে কী সাজানোই সাজাতেন দোকানটা। রাজাবাবু গুজরাটী লোক। তাঁর দোকানের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর বড় একটা ছবি ছিল, ছবির চারপাশে ঝকঝকে ফ্রেম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছবিও ছিল দোকানে। রাজাবাবু সাইকেলে চেপে দোকানে আসতেন, কিন্তু সাইকেলটা ছিল লেডীজ সাইকেল। কেন রাজাবাবু লেডীজ সাইকেল চাপেন—এই রহস্য যতিকিশোরদের ছেলেবেলায় খুব অবাক করত। পলটু একদিন বলেছিল, লাউ কুমড়ো বয়ে নিয়ে বেড়ায় তো তাই।

কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় যতিকিশোর হো হো করে হেসে উঠল। এমন হাসি যে আচমকা হাসতে গিয়ে হঠাৎ যেন পেটে লাগল।

সরসী ঘরে এসে পড়েছিল। বার বার ওপর নীচ করতে হবে বলে সে টিনের ওপর রঙ করা গোল ট্রেতে বসিয়ে দু' কাপ চা. একটা কাচের ডিশে কিছু তেলেভাজাও এনেছে।

যতিকিশোরের হাসি দেখে সরসী প্রথমে ভেবেছিল তার জন্যেই কি হাসল যতি? নিজের কাপড়চোপড়, হাতে-ধরা ট্রের দিকে তাকাল। তারপর

যতিকিশোরের দিকে। "কী হল, অত হাসছ?"

হাসিটা দমন করে ফেলেছে যতিকিশোর, পেটের সেলাইয়ের টানটা তখনও তার মনে কেমন অস্বস্তির মতন লাগছিল।

সরসী কাছাকাছি এসে চা দিল। ট্রে-টা পায়ের কাছে একপাশে রাখল। তেলেভাজার ডিশটা উঠিয়ে নিয়ে বসল।

"নাও।"

"এতো?"

"তোমার তো দু-একটা", সরসী হাসি মুখে যতিকিশোরকে মনে করিয়ে দিল, যতি দু-একটাই খাবে বলেছিল।

যতিকিশোর একটা তেলেভাজা নিল। "তুমি চালাও।"

সরসী দু' হাঁটুর ওপর চমৎকার করে ডিশটা রাখল। রেখে নিজে গরম একটা বেগুনী নিল। "কেন হাসছিলে বললে না?"

একজনকে মনে পড়ে গেল। আমাদের সেই রাজাবাবু..."

"তাতেই হাসি?"

"না, হাসি সে জন্যে নয়...অন্য একটা ব্যাপারে," যতিকিশোর অস্বস্তি বোধ করছিল, "তোমার দুর্গাদি এসব ভালই করে দেখছি।"

"দুর্গাদি যা ধোঁকা করে খুব ভাল...কি স্বাদ। কাল তোমায় খাওয়াব।"

"অনেকদিন পবে তেলেভাজা খেলাম। বেশ কয়েক বছর পরে..."

"খাও। কিছু হবে না...।" সরসীর কথা বলার ভঙ্গি, বসার ভঙ্গি, খাবার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল তার আচরণে বয়েসের কোনো লক্ষণ নেই। জীবন্ত, সহজ. স্বাভাবিক।

যতিকিশোর আরও একটা নিল। খুব গরম। আঙুল পুড়ে যায় যেন। ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করতে লাগল। নিজেরই হাসি পাচ্ছিল। বয়েস কি কমে যাচ্ছে? তার অফিসের লোক এই দৃশ্যটা দেখলে হাঁ হয়ে যাবে. ভাববে যে, সাহেব শালা মাল খেয়ে বেগুনী পিঁয়াজী খাচ্ছে।

সরসী খেতে খেতে বলল, "আমাদের শেরপুরে আর একটা জিনিস খুব সুন্দর তৈরী করত। বল তো কী?"

কত কি হত শেরপুরে, কোনটা বলবে যতিকিশোর! জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"কুলপি মালাই।..সেই লছমন কুলপিঅলার কুলপি। মনে পড়ে? গরম কালে বিকেল বেলায় কেমন এসে হাঁক দিত—কু-ল-ফি মা-ল-হা-ই।" বলতে বলতে সরসী হাঁকটা অবিকল লছমনের মতন মোটা গলা করে সুর টেনে টেনে বলতে গেল। বলে হেসে ফেলল।

ভোলে নি যতিকিশোর। লছমন তার মস্ত হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে আসত পাড়ায়, হাঁড়ির গায়ে লাল কাপড় জড়ানো। পাইয়ার ওপর হাঁড়ি রাখত।

হাতে একটা ছোট ছুরি, একগাদা শালপাতা। ছেলেমেয়েরা ভিড় করে ধরত। লছমন সব চেয়ে সস্তা কুলপিগুলো বার করত, চোখের পলকে মাথার ঢাকনা উঠিয়ে শালপাতায় কুলপি ঢেলে দিত। বেশী দামী কুলপিতে লছমনের হাতযশ ছিল; পেস্তাবাদাম মেশানো অমন কুলপি সত্যিই আর কোথাও খায় নি যতিকিশোর। সিদ্ধির কুলপিও আনত লছমন, বাবা জ্যেঠারা খেত কেউ কেউ, শোনা যেত নিশিকাকা আর নিশিকাকার বউ দুজনেই সিদ্ধির কুলপি খেয়ে বেদম হাসাহাসি করত, নিশিকাকিমা গান গাইত গলা ছেড়ে। যতি-কিশোররা যখন স্কুল ছাড়ব ছাড়ব করছে তখন একদিন পাঁচ-সাত বন্ধু মিলে লছমনের স্পেশ্যাল সিদ্ধির কুলপি চড়িয়েছিল মিউনিসিপ্যালিটির কাঁঠালতলায় বসে। দু-তিনটে করে। সেদিন রাত্রে স্বর্গমর্ত্য বলে কিছু থাকল না। যত রকম কেলেঙ্কারিই হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি হল বাসুদেবকে নিয়ে। সারা রাত সে সবুজ জলের মতন বমি করল। বাড়িতে ছুটোছুটি, ডাক্তার কম্পাউন্ডার, বেটা বুঝি কলেরায় মরে। পরের দিন সন্ধ্যেবেলা বাসু ধাতে এল।

যতিকিশোর হেসে বলল, "ওরে বাব্বা, লছমনের কুলপি মনে থাকবে না —বেশ মনে আছে!"

সরসী কাচের প্লেটটা নামিয়ে রাখল। তার চোখে কেমন একটা জব্দ করা হাসি। বলল, "তুমি আমার জ্যামিতি বাক্সর পয়সা চুরি করে কুলপি খেয়েছিলে।"

যতিকিশোর প্রথমটায় ঘাবড়ে গেল। প্রবল আপত্তি প্রকাশ করার জন্যে মাথা নাড়তে লাগল। কিন্তু সরসী বাঁ হাতে বেগুনি রেখে, দাঁতের ফাঁকে খাবার চিবোতে চিবোতে ডান হাতের আঙুল তুলে বলল, "এই, খবরদার, মিথ্যে কথা বলবে না। তুমি আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে গেলে খোকনবাবুর দোকান থেকে জ্যামিতি বাক্স কিনে এনে দেবে বলে। ফিরে এসে বললে, দোকানে নেই, কাল পরশু পাওয়া যাবে, দামটা দোকানে দিয়ে এসেছ।"

যতিকিশোর অদ্ভুত মুখ করে হাসতে লাগল।

"সেই জ্যামিতি বাক্স রোজই আসছে...। আর তুমি আমায় সোহাগ করে কুলপি খাওয়াচ্ছ! কি চোর ছিলে বাবা!" সরসী হেসে মরে যাচ্ছিল।

যতিকিশোর ভুরু কুঁচকে বলল, "শীতকালে জ্যামিতি বাক্স লাগে, ক্লাস প্রমোসানের পর। তুমি নতুন ক্লাসে উঠে জ্যামিতি বাক্স কিনলে শীতের সময় আর আমি সেই পয়সা'য় তোমায় গরম কালে কুলপি খাওয়ালাম! বাঃ!"

সরসী ধমক দিযে বলল, "এই চোর চোট্টামি করো না। আমার জ্যামিতি বাক্স ছিলই না—কবে হারিয়ে ফেলেছিলাম। হাফ্ ইয়ারলি পরীক্ষার সময় আবার কিনতে হচ্ছিল। হাফ্ ইয়ারলি কখন মশাই?"

যতিকিশোর এবার নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে দিল। সে পারবে না আর জোরে হেসে উঠল। সরসীও হাসছে।

জোর হাসির শেষের দিকে আবার পেটের সেলাইয়ের জায়গায় টান লাগল যতিকিশোরের। এবার সামান্য জোরে। হাসি থামিয়ে দম বন্ধ করল যতিকিশোর। পেটের কাছে হাত দিল।

সরসী চায়ের কাপ, ডিশ তুলে নিয়ে টেবিলে রেখে এল।

"বৃষ্টির ছাট আসছে যে..." বাইরের দরজার দিকে তাকাল সরসী। দরজাটা বন্ধ করে দেবে। মেঝেতে জল এসে যাচ্ছে।

যতিকিশোর অন্যমনস্কভাবে বলল, "আমার সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই দাও তো।"

সিগারেট দিল সরসী। দরজা বন্ধ করে দিল বাইরের।

যতিকিশোর সিগারেট ধরাল। তার ভাল লাগছিল না। এই হাসি এই আনন্দ সে যখনই পরিপূর্ণভাবে নিতে চেষ্টা করছে ঠিক তখনই তার এই রকম লাগছে কেন? কেন এই বেদনা, যা থাকার কথা নয়, অথচ আছে? বিষণ্ণ চোখে যতিকিশোর বিছানার দিকে তাকাল, জানালার দিকে, তারপর আলোর দিকে। টিউব লাইটটা সে কোনদিনই পছন্দ করে না। চোখে লাগে। এখন আরও লাগছিল।

"তুমি ছোট বাতিটা জেবলে দেবে?" যতিকিশোর চোখ দিয়ে আলোর দিকটা দেখাল।

সরসী টিউব লাইট নিবিয়ে ছোট আলো জেবলে দিল। ঘরের উজ্জ্বল ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রভ হয়ে ম্লান শান্ত ভাব হল।

বিছানার ওপর বসল সরসী। যতিকিশোরকে দেখছিল।

"আজ সারারাতই বৃষ্টি হতে পারে," সরসী বলল।

যতিকিশোর নীরব। উদাস যেন। কোথায় যেন কোনো কিছু তার লাগছে। চোখের তারা 'ম্লান।

"কি ভাবছ?" সরসী শুধোলো।

যতিকিশোর প্রথমে কিছু বলল না, সরসীর দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, "তোমার শেরপুর যেতে ইচ্ছে করে না?"

"ইচ্ছে!"

"একবার গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে না?"

সরসী দু' মুহূর্ত যতিকিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "করে বই কি!"

"আমারও করে। আজকাল প্রায়ই করে।"

সরসী বিছানার ওপর দু' হাতে ভর করে অলস ভঙ্গিতে বসে ছিল,

কানের লতিতে এক গুচ্ছ এলো চুল জড়িয়ে আছে; সাদা খোলের শাড়ির গায়ে ঘন বাসন্তী রঙের পাড় তার চেহারাকে আরও শান্ত, নরম করে তুলেছিল যেন। সরসী হেসে বলল, "মন কেমন করে নাকি?"

"বাবাকে সেদিন জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"কি, শেরপুরের কথা?"

"হ্যাঁ। আজকাল শেরপুরে আমাদের মহল্লায় পুরোনো বাঙালী আর নাকি প্রায় নেই। অনেকে মারা গেছেন, ঘরবাড়ি বেচে দিয়ে চলে গেছেন অনেকেই। দিনকাল সব পালটে যাচ্ছে—লোকে ভরসা পায় না। তাছাড়া সুবিধে অসুবিধে......"

সরসী সামনের দিকে ঝুঁকে বসল। "সেই পুরোনো শেরপুর তুমি আর কোথায় পাবে?"

"খানিকটা নিশ্চয় পাব; সব কি আর নতুন হয়?" যতিকিশোর ম্লান করে হাসল একটু।

সরসী বিছানার ওপর বসেই সামান্য নড়াচড়া করল, একবার ডান দিকে হেলল একটু, তারপর বাঁ দিকে, তার হাঁটু দুলছিল। হাসি-হাসি মুখে বলল, "তা হলে যাও না একবার, ঘুরে এস। এমন কিছু দূর নয় শেরপুর, একটা রাত্তির লাগবে।"

যতিকিশোর উঠল। সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানের মধ্যে ফেলে দিল। বাবাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, পুরোনো কারও সঙ্গে যোগাযোগ আছে কি না! বললেন, নেই। বসন্তবাবুর সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল তা বসন্তবাবুও মারা গেছেন।"

সরসী আলোর দিকে তাকাল, আলোটা থেকে থেকেই কমে এসে আবার স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। কে জানে এই বর্ষা-বাদলায় হুট্ করে আলো চলে যাবে কি না।

যতিকিশোর টেবিলের ধার ঘেঁষে পিছু হেলে দাঁড়িয়ে থাকল। বলল, "তোমাদের সঙ্গেও তো কারুর কোনো যোগাযোগ নেই?"

মাথা নাড়ল সরসী। না। বলল, "পুরোনো লোক নিয়ে তুমি কি করবে! এক-আধদিনের জন্যে বেড়াতে যাবে, থাকার জায়গা কি পাবে না—খুব পাবে। না হয় হোটেল—।"

"হোটেল?"

"শেরপুরে একটাও হোটেল হয় নি ভাবছ এতোদিনে? নিশ্চয় হয়েছে।"

যতিকিশোর হোটেলের কথায় উৎসাহ বোধ করল না। বলল, "বাবা বলছিলেন, কলকাতায় ভূপেনবাবু থাকেন।"

"কে ভূপেনবাবু?"

"সেই যে বাস সার্ভিসের ভূপেনবাবু। দুটো বাস ছিল যাঁর......"

"ও! বুঝেছি! মোটা মোটা খদ্দরের কাপড়-জামা পরতেন, মাথায় টাক......"

"তিনি এখন কলকাতায় থাকেন। তাঁর বাড়িটা নাকি বেচে দেন নি। ফেলে রেখেছেন।"

"কোথায় থাকেন ভূপেনবাবু?"

"কলকাতাতেই আছেন। কোথায় তা বাবা জানেন না।"

সরসী কি যেন ভাবছিল। একটা কথা তার মনে পড়েও পড়ছে না। হঠাৎ বলল, "দাঁড়াও আমি আসছি।"

সরসী চলে গেল। যতিকিশোর কয়েক মুহূর্ত একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ঘরের মধ্যে অকারণে নড়াচড়া করল। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সামান্য। বাইরে বৃষ্টির তোড় কমে এসেছে। বাড়ির সামনে রাস্তায় কোথাও বাতি জ্বলছে না। বড় রাস্তায় আলোগুলো ঝাপসা, ভিজে। ঝিঁঝি ডাকছে চারদিক জুড়ে। ব্যাঙ ডাকছিল একটানা।

যতিকিশোরের কি খেয়াল হল, ব্যালকনির দিকের দরজাটা খুলে দিল। ঠাণ্ডা, ভেজা বাতাস এল হুহু ক'রে, মিহি বৃষ্টির জল বাতাসে ভেসে এসে মুখে লাগল অল্পস্বল্প। ব্যালকনি ভিজে। জল জমেছে সামান্য।

সরসীর গলা পেল যতিকিশোর।

পেছনে এসে সরসী বলল, "আমি একজনের খবর দিতে পারি। মাসিকে জিজ্ঞেস করছিলাম। গণেশবাবুর সেই কুঠি মনে আছে তোমার? সেই দুর্গের মতন বাড়িটা। সেটা ভূতের বাড়ি হয়ে পড়ে আছে। গণেশবাবুর ভাগ্নে এদিকেই কোথায় থাকে। মাসির সঙ্গে আমাদের এখানকার শিব মন্দিরে প্রায় দেখা হয়।"

যতিকিশোর সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "চলো, একবার যাই।"

"আমি?"

"কেন, তোমার যেতে ইচ্ছে করে না?"

"করে—," সরসী মৃদু গলায় বলল, দু' দণ্ড থেমে থাকল, আবার বলল, "মাঝে মাঝে আজকাল আমারও খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু কি হবে বলো, যা ফেলে এসেছি আর কি তা ফিরে পাব?"

কে জানে! হয়ত কিছু পাব, হয়ত পাব না। যতিকিশোর জানে না, বলতে পারছে না সে। তবু এই যাবার আগ্রহ ইদানীং তাকে ব্যাকুল করে তোলে। মনে হয় সে যেন স্টেশনের কাছে সেই জোড়া শিরীষগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে— ছেলেবেলায় যেমন থাকত, হালুইকরদের দোকানের পাতা উড়ছে বাতাসে, মুটকি জমাদারনীটা লাল মোরমের ধুলো ওড়াচ্ছে ঝেঁটায়, পানঅলা অনাদি ঝকমকে ঘটিতে খয়ের গুলছে মাথা নেড়ে নেড়ে আর ছোট লাইনের প্লাটফর্মে গাড়ি দাঁড়িয়ে শেষ সিটি দিচ্ছে। শেরপুর তাকে হঠাৎ হঠাৎ এই ভাবে ডেকে উঠছে,

বাড়িতে, অফিসে, কখনো ভোরের ঘুমে, কখনো দুপুরের অবসাদের মাঝখানে, কখনো বা রাত্রে—স্বপ্নে।

যতিকিশোর অনেকক্ষণ পরে বলল, "কিছুই পাব না?"

"কেমন করে বলব বলো। দুঃখও পেতে পারি।"

"না হয় পেলাম! তুমি চলো।"

"আমায় নিয়ে গিয়ে কি হবে?...আমার সবটাই তো সুখের নয় সেখানে... তুমি একলাই যাও।"

যতিকিশোর পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছিল ব্যালকনির দিকে, তার মাথায় পিঠে বৃষ্টির গুঁড়ো লাগছিল; সরসীর দিকে সরাসরি তাকিয়ে সে বলল, "তুমি না গেলে আমি কত কি খুঁজে পাব না, শশি। তুমি আমি একসঙ্গে জীবন কাটিয়েছি, তুমি না থাকলে কে বুঝবে তোমার যতিকে!"

সরসী সন্দেহের গলায় বলল, "তুমি কি খুঁজতে যাচ্ছ সেখানে?"

যতিকিশোর অনিশ্চিত গলায় বলল, "কি জানি! চলো, দেখব কি খুঁজে পাই।"

সরসী নীরব থাকল।

৭

বর্ষার শেষ মুখে যতিকিশোররা শেরপুর আসতে পারল। আসার আগের সমস্ত ঝঞ্ঝাট সরসীরই। মাসিকে দিয়ে গণেশবাবুর ভাগ্নের ঠিকানা যোগাড় থেকে ভাগ্নের সঙ্গে দেখা করা, কেন যে সরসীরা শেরপুর যেতে চাইছে তার একটা মানানসই কারণও দেখাতে হল সরসীকে। গণেশবাবুর ভাগ্নে শিউপ্রসাদজি মানুষটি ভাল, বললেন. 'উয়হ্ তো বিলকুল জাঙ্গাল হো গিয়া হ্যায়, রাহেগী ক্যায়সে?' দু' একজন লোক অবশ্য কিছুদিন আগেও ছিল, মকাই লাগাত জমিতে, ভিণ্ডি বুনত—তারা পালিয়ে গেছে না আছে দেখতে হবে। তল্লাস লাগাতে হবে আর কি। তল্লাস লাগাতে চিঠি লিখতে হল, তার জবাব এল, তারপর সরসী জানতে পারল যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। গণেশবাবুর ভাগ্নে জানালেন—স্টেশনে লোক থাকবে, বাড়িতেও চাকর থাকবে, চাবি স্টেশনে নেমেই পেয়ে যাবে সরসী।

মাস খানেক কি তার বেশী সরসীর এই হুজ্জোত সামলাতে গেল। রাগের ভান করে সে যতিকিশোরকে বলত, 'তোমার জন্যে এই ছোটাছুটি আমার ভালো লাগে না। ভদ্রলোক কি ভাবছে বল তো? ভাবছে আমি কোনো মতলব নিয়ে যাচ্ছি।' যতিকিশোর হাসতে হাসতে বলেছে, 'কেন, তুমি না বলেছ তোমার এক আত্মীয় তাদের অফিসের হয়ে জমি জায়গা প্রপারটি কেনার খোঁজ করছে।' ভুরু কুঁচকে সরসী বলেছে, 'রাখো, জমি জায়গা কেনা। ভূতের বাড়ি।'... ভূত তোমায় ছোঁবে না।'... 'তোমার মতো ভূত পাশে রয়েছে বলে?'

অফিস থেকে ছুটি নিতে হল সরসীকে, সপ্তাহ খানেকের। মাসিকে একলা ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে বলে চিন্তাই হচ্ছিল সরসীর। মায়ালতা কিন্তু কোনো রকম অনুযোগ করলেন না। যতিকিশোরের আগ্রহে যাওয়া, তার সঙ্গে থাকা—সবই মাসি জানতেন। তিনি কি বুঝেছিলেন কে জানে, অন্য কোন আপত্তিও তোলেন নি।

যতিকিশোর যাবার আগের দিন বাড়িতে মীনাকে বলল, অফিসের কাজে সে কয়েকদিন বাইরে যাচ্ছে। স্বামী কোথায় যাচ্ছে জানার কোন আগ্রহ মীনার

ছিল না, মুখের কথায় একবার শুধু বলল, কোথায়? যতিকিশোর অক্লেশে বলল, দিল্লি।

আসার দিন কলকাতায় এলোমেলো বৃষ্টি ছিল সকালে; বিকেল একেবারে খটখটে। হাওড়া স্টেশনে পেঁাছে যতিকিশোর দেখল সরসী এসে গেছে। মালপত্র খুব একটা কম নয়, সুটকেস, বেডিং, বেতের টুকরি, টিফিন কেরিয়ার। যতি-কিশোরও খালি হাতে আসে নি। তার সঙ্গেও না না করে চার-পাঁচটা লাগেজ। যতিকিশোর হেসে বলল, 'করেছ কি! এতো লাগেজ্?' সরসী গম্ভীর হয়ে বলল, 'একটা বাদ ছিল, সেটাও খুঁজে পেলাম।' প্রথমে না বুঝলেও পরে বুঝল যতিকিশোর, বুঝে হেসে ফেলল।

রাত্রে ট্রেন। একস্প্রেস। কামরায় মালপত্র উঠে যাবার পর যতিকিশোব নিশ্চিন্ত গলায় বলল, "কাল সকালে আমরা শেরপুরে।"

ঠাট্টা করে সরসী বলল, "তুমি এক কাজ করো না, কণ্ডাকটার গার্ড বেচারীকে শুতে পাঠিয়ে তুমিই তার চাকরিটা করে দাও।"

কোন সন্দেহ নেই যতিকিশোরকে সামান্য উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

গাড়ি ছাড়ার পর পথে পশলা পশলা বৃষ্টি এল, গেল; কোথায় থামল, কোথায় এল কেউ খেয়াল করল না; মাঠের নিঃঝুম অন্ধকারে কখন চাঁদ উঠল মেঘ ডিঙিয়ে, কখন আবার ঢেকে গেল; টিমটিমে আলো মাথায় নিয়ে কত ঘুমন্ত স্টেশন পেরিযে গেল একে একে, গুম গুম শব্দ হল ছোটখাট পুলেব ওপর; কতবার এঞ্জিনে হুইসিল বাজল, বড় বড় স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল, কারও তেমন খেয়াল হল না। গদির ওপর পাতলা বিছানায় শুয়ে নরম নিষ্প্রভ আলোয দু'জনে গল্প করল, থামল, আবার গল্প করল, হাই তুলল বড় বড়, শেষ রাতে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খেল দু'জনে, তারপর সরসী ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন আর ভোর নেই, রোদ উঠেছে, শেবপুরে পেঁাছে গেল যতিকিশোররা।

প্লাটফর্মে নেমে যতিকিশোর অবাক। আগে একটানা এতটা শেড ছিল না, এখন প্রায় অর্ধেকটা ডাউন প্লাটফর্ম শেড দিয়ে ঢাকা। তখন ইঁটের মতন লাল রঙ ছিল স্টেশনের অফিস ঘরগুলোয়, এখন হলদেটে। তখন ছিল ছিমছাম পরিষ্কার, এখন ঘিঞ্জি, এই সকালেই কত ঘিঞ্জি দেখাচ্ছে। দুটো কল হয়েছে নতুন, কৃষ্ণচূড়ার গাছ বসিয়ে চারপাশে বাঁধানো হয়েছে, টি স্টলের গায়ে দু' তিনটে বেঞ্চি।

যতিকিশোর বলল, "আমি শেষ এসেছি বাবা যখন কলকাতায় জমি কিনলেন। ধরো, বছর বারো তেরো আগে। এই ক'বছরেই কত পালটে গেছে।"

সরসী নামানো জিনিসপত্র দেখে নিচ্ছিল; গোটা তিনেক কুলি তার

আশেপাশে।

গণেশবাবুর লোক কোথায়? কে তাঁর লোক? কিছু লোকজন নেমেছে গাড়ি থেকে। এক দঙ্গল দেহাতীও ছিল। চা-অলার হাঁক, মাথায় জালের ঝাঁকা নিয়ে জনা দুই ফেরিঅলা 'গরম্ জিলাবি' হাঁকছে। গাড়িও ছাড়ে ছাড়ে।

ভিড় খানিকটা পাতলা হলে সরসী আশেপাশে তাকাতে লাগল। যতিকিশোরও।

মোটা খাকি কাপড়ের শার্ট পরা, খাটো ধুতি, কালো চেহারার এক মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক ধীরে ধীরে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছিলেন।

যতিকিশোর বলল, "সরসী, ওই লোকই হবে।"

সরসী দু' পা এগিয়ে গেল।

হ্যাঁ, গণেশবাবুর ভাগ্নেরই লোক; নাম অর্জুন মিশির। সরসীদের নিয়ে যাবার জন্যে বাইরে জিপ গাড়ি এনে রেখেছেন। খাতির করে ডেকে নিলেন মিশিরজী।

স্টেশনের বাইরে মিশিরজীর জিপ দাঁড়িয়ে ছিল; রঙের কোনো বালাই নেই, মাথার ক্যাম্বিস ফুটোফাটা, ধুলোয় ময়লায় গাড়িটার যা চেহারা তাতে মনে হয় কোনোদিন গাড়ির গায়ে হাত পড়ে না। নানা জায়গায় তোবড়ানো।

মালপত্র উঠিয়ে দিলেন মিশিরজী। সরসীকে সাবধানে উঠতে হল। যতি-কিশোর বসল সামনে, মিশিরের পাশে। নেহাত যে-ক'টা যন্ত্রপাতি না থাকলে গাড়ি চলে না, মাত্র সেই ক'টি যন্ত্র ছাড়া মিশিরজীর গাড়িতে কোনো বাহুল্য নেই। গাড়ি ছাড়ার পর মনে হল, শেরপুরের সেই পুরোনো টাঙার চেয়ে এ বস্তু এমন কিছু ভাল নয়। স্টেশনে আগে টাঙা স্ট্যান্ড ছিল, এখন আর নেই —উঠে গেছে, তার বদলে সাইকেল রিকশা আর টেমপো-ট্যাক্সি।

যেতে যেতে রাস্তায় মিশিরজী তার পরিচয় দিলেন। সরকারী রাস্তা তৈরীর সাব-কনট্রাকটার, রেলের ছোটখাট কাজও ধরেন, এক ছেলে রাঁচিতে পুলিশের কাজ করে, আর এক ছেলে স্কুলে পড়ে।

স্টেশন থেকে গণেশবাবুর সেই আস্তানা কম দূর নয়। গাড়িতে আসতে আসতে মিশিরজী অনেক কথাই বললেন। বাড়ির একটা দিক তিনি সাফসুফ করিয়ে রেখেছেন। তা হলেও পুরোনো পরিত্যক্ত বাড়ি, সাবধানে থাকবেন। একটা লোক ঠিক করে দিয়েছেন মিশির, রসুই করে দেবে, পানি এনে দেবে। হরবাখাত তাকে পাওয়া যাবে।

মিশিরের কথাবার্তা থেকে মনে হল, তিনি ধরে নিয়েছেন, যতিকিশোর আর সরসী স্বামী-স্ত্রী। সরসীর সিঁথিতে সিঁদুর নেই দেখে হয়ত খানিকটা অবাক হয়েছিলেন। তবে কলকাতার এইসব বাঙালী সাহেববাবুদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা, অনেক দেখেছেন এসব, কাজেই ওটা নিয়ে তেমন মাথা

ঘামালেন না; শুধু আকারে ইঙ্গিতে বললেন, এই কাঠগুদাম আর লাগোয়া জমি কেনাবেচা হলে তাঁর থোড়া কুছ লাভ হবে।

গণেশবাবুর কাঠগুদোম একটা দুর্গের মতনই। বিঘে দু' আড়াই জমি ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঁচু পাঁচিল। এখন অবশ্য পাঁচিলের বারো আনাই ভেঙেচুরে স্তূপ আর মাটির ঢিবি হয়ে রয়েছে, ফাঁকে ফোকরে অজস্র আগাছা জন্মে বড় হচ্ছে দিনের পর দিন। সদর বাড়িটা দোতলা, অর্থাৎ যে অংশটুকু বসবাসের জন্য করা হয়েছিল সেটা দোতলা; তার গা ধরে দু' পাশে লম্বা ধরনের একতলা চালা বাড়ি। নদীর বড় বড় পাথর, কাদা, সুরকি, এই সব মিলিয়ে এ বাড়ির গাঁথুনি হয়েছিল, মাথায় খাপরার চাল, পাথর, ইট, কাঠ যাবতীয় যা জুটেছিল তাই দিয়ে গণেশবাবু তাঁর এই দুর্গ তৈরী করেছিলেন। জঙ্গলের গাছ কেটে এনে কাঠ জমানো হত। শালের খুঁটি, শিমুলের গুঁড়ি, কাঁঠালের আর নিমের মোটা মোটা ডাল। আরও কত রকম কাঠ আসত। একদিকে কাঠ জমত, অন্য দিকে তার চেরাই হত বড় বড় হাত-করাতে। এ ছাড়াও গণেশবাবু এখানে তাঁর গদি বসিয়েছিলেন। চালা ঘরের কুঠরিতে আলুর বস্তা, পেঁয়াজের বস্তা, রেড়ি, তিসি, ডাল, গয়ার দিক থেকে আনানো তামাক, কত কি থাকত। কাছাকাছি গ্রাম থেকে এসব তিনি সংগ্রহ করতেন কিছুটা, কিছুটা আসত তাঁর মিলিটারির ডিসপোজ্যালে কেনা, ঝড়তি পড়তি একটা ট্রাক মারফত নানান জায়গা থেকে। ভদ্রলোক ব্যবসাদার হিসেবে বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিলেন। তখন এদিকটায় কত ব্যাপারী আসত যেত, বয়েল গাড়ি আসত অনবরত, মাল দিত মাল নিত, কাঠ বইতো, গদিতে কাজের লোক ছিল পনেরো বিশজন। ভাগ্যের মার খেলেন গণেশবাবু যোয়ান ছেলেটা মারা গিয়ে। মুঙ্গেরে গিয়েছিল, সেখানে কলেরায় মারা গেল। তার চার পাঁচ মাস পরে গণেশবাবুর স্ত্রী গেলেন সেপ্‌টিক হয়ে। এক মেয়ে ছিল, তার বিয়ে দিয়েছিলেন, সে চলে গেল আজমীর। গণেশবাবুর গদি লুঠ হল আরও পরে। সেই সময় তাঁকেও এমন জখম করল যে মানুষটা একেবারে পঙ্গু হয়ে গেলেন। গুদোম আর গদি ছেড়ে তিনি একদিন চলে গেলেন।

সেই বাড়ি বা গণেশবাবুর কুঠি আজ ভাঙাচোরা হয়ে, অর্ধেক ধসে পড়ে অর্ধেক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নির্জন, নিষ্প্রাণ, স্তব্ধ। শুধু তাঁর বাড়ির এলাকার মধ্যেকার বড় কুয়াটা এখনও কাছের গ্রামের মানুষজনের পায়ের চিহ্ন নিয়ে বেঁচে আছে। জলটা ভাল, গাঁয়ের লোক জল নিতে আসে। আর সামনের জমিতে কে যেন মকাই বুনে রেখেছে, গ্রামেরই কেউ।

সরসী বলল, "এখানে থাকব কি করে?"

যতিকিশোর কেমন রোমাঞ্চিত হচ্ছিল, যেটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার উত্তেজনা প্রায় আতিশয্যের মাত্রায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বলে সরসীর কথা উপেক্ষা

করে বলল, "কেন, অসুবিধে কোথায়? ঘর রয়েছে, দোর রয়েছে......"

ঘরদোর অবশ্যই আছে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলা। মেঝে কাঠের, মাথার জানালাও কাঠের, ছাদটা অবশ্য টালির। গণেশবাবু নিজে থাকতেন বলে এই দিকটার মাথায় টালি বসিয়েছিলেন। মস্ত ঘর। পাশাপাশি আরও ঘর আছে। দুটো চাকর মিলে ঘরদোর সাফ করেছে ক'দিন। পুরোনো আমলের তক্তপোশ, লম্বা গোছের একটা কাঠের টেবিল, লোহার একটা সিন্দুক, আরও কিছু কিছু জিনিস পড়ে ছিল।

মিশিরজী চলে গেছেন; বলে গেছেন, বিকেলে সময় করতে পারলে খোঁজ নিয়ে যাবেন। রসুয়ের জন্যে, যে কোনো কাজের জন্যে ভকত্ রইল। বাবুদের ভাবনার কিছু নেই।

সরসী তক্তপোশের উপর বসে পড়েছিল। তার মনে হচ্ছে না, এখানে থাকা যাবে! যতির কোনো সাংসারিক বোধবুদ্ধি নেই। থাকলে বুঝতে পারত—এই জায়গায় থাকার কত অসুবিধে।

যতিকিশোর একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রোদ আসছে। পাশাপাশি দুটো জানালা, লম্বার চেয়ে চওড়ার দিকটাই বেশী। জানালায় দাঁড়িয়ে যতিকিশোর বাইরের অনেকটাই দেখতে পাচ্ছিল। শক্ত পাথুরে মাঠ সামনে, দু' চারটে কাঁটা ঝোপ, মাঠটা ক্রমশই ঢালু হয়ে গেছে, তার পর আর মাঠ নয়, ছোট্ট গ্রাম, আট-দশ ঘরের গাঁ, মাটির ঘর, মাথার ওপর খাপরার ছাদ, গাছপালা আর ক্ষেত সবুজ হয়ে আছে, ছাগল চরছিল, গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে রোদ্দুরে ভরা আকাশ দূরে দিগন্তে ছড়িয়ে গিয়েছে।

যতিকিশোর খুশীর গলায় ডাকল, "এ দিকটা একবার দেখে যাও...।"

সরসী উঠল না। বলল, "তুমি দেখো।"

"আরে এসো না— দেখেই যাও।"

সরসী উঠল। কিছু দেখার জন্যে নয়, যতিকিশোর ডাকছে বলে।

যতিকিশোর জানালা ছেড়ে সামান্য সরে এসে চোখের ইশারায় বাইরেটা দেখাল।

দেখলে সরসী। মুখ ফিরিয়ে বলল, "শহরে হোটেল হয়েছে শুনলে, ডাকবাংলোও ছিল। সেখানে উঠলেই পারতে।"

"কেন?"

"এখানে তুমি থাকতে পারবে?"

"বাঃ থাকবো বলেই এলাম।...তুমি পারবে না?"

"আমার জন্যে বলি নি। আমি জীবনে অনেক খারাপ জায়গায় থেকেছি। তুমি থাকো নি।"

যতিকিশোর কিছু যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল, একটু হেসে বলল, "চেষ্টা

করে দেখা যাক না! না পারলে হোটেল, ডাকবাংলো তো থাকলই।"

সরসী আর কিছু বলল না। নিজের জন্যে সে ততটা ভাবছিল না, যতিকিশোর এই বাড়িতে কেমন করে থাকবে সে বুঝতে পারছিল না। আগে সরসী এতটা ভাবে নি, তার মনে হয় নি—অতদিনের পুরোনো, অব্যবহৃত একটা বাড়িতে থাকার কত ঝকমারি থাকতে পারে। খাওয়াদাওয়া শোওয়া বসা সবেরই অসুবিধে হবে যতির। যতি আসার জন্যে যখন নাচল তখনই সরসীর বোঝা উচিত ছিল, মাঠে ময়দানে গড়াগড়ি দিয়ে ঝুরি ভাজা আর লাড্ডু খেয়ে দিন কাটিয়ে দেবার বয়েস আর যতির নেই, সে স্বাস্থ্যও আর তার কোথায়! কষ্ট হবে যতির। কে জানে, কাজটা বোধ হয় ছেলেমানুষের মতন হল।

যা হয়ে গেছে, এসে যখন পড়েছে—তখন হাত গুটিয়ে বসে থেকে লাভ নেই। সরসীকে এখন এক এক করে সব দেখে নিতে হবে, দেখতে হবে পাশের ঘরটার কি অবস্থা, কোথায় স্নানের ব্যবস্থা করা যাবে, রান্নাবান্নারই বা কি হবে আজ!

বাইরে এল সরসী। ঘরের গায়ে সরু লম্বা টানা বারান্দা। সামনে কাঠের রেলিং। বাঁ দিকের একেবারে শেষে রেলিং ভেঙে গেছে, ফাঁকা। সামনের দিকে তাকাতেই সরসী দেখল, মকাই ক্ষেতের বাড়-বাড়ন্ত চেহারা, কুয়া তলায় দেহাতী মেয়ে বউ জল নিতে এসে কথা বলছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তাকে। ভকত্ নীচে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। ভকত্‌কে ডাকল সরসী।

এক এক করে সবই দেখল সরসী। তার অত দুশ্চিন্তার কারণ নেই বলে মনে হচ্ছিল। গণেশবাবু ধনী লোক ছিলেন, তিনি মারা যাবার পর এ বাড়ির চৌদ্দ আনাই হয় কেউ নিয়ে গেছে, না হয় নষ্ট হয়েছে; তবু সামান্য যা রয়েছে তাতে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। নেয়ারের একটা খাট পাওয়া গেল, পালঙ্কও ছিল একটা বিশাল মাপের, কাঠের চেয়ার, এমন কি সেই পুরোনো দিনের সেজ-বাতিও একটা। আরও কত কি পড়ে আছে, মিশিরজী মানুষটি খুবই কাজের। দুটো লোক খাটিয়ে তিনি বাড়িটার অনেক কিছুই ব্যবহারযোগ্য করে রেখে-ছিলেন। জল রাখার জন্যেও ড্রাম পাওয়া গেল, নতুন কলসি, রান্নাঘরে একটা উনুন পর্যন্ত।

যতিকিশোরও সরসীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল। হেসে বলল, "মিশিরজীকে আমার ভগবান বলে মনে হচ্ছে।"

ততক্ষণে সরসী কিছুটা আশ্বস্ত। বলল, "চুপ করো; ভগবান দেখিও না। দুটো চালডালের ব্যবস্থা আগে করতে দাও।"

যতিকিশোর উচ্চহাস্য হাসল, হেসে বাড়ির সামনেটায় ঘোরাফেরা করতে বেরিয়ে গেল।

সরসীর সংসারজ্ঞান অসামান্য। ভকত্ লোকটাও একেবারে আনাড়ি নয়;

বাঙালী বাবুদের বাড়িতে কাজ করেছে অনেকবার, তার কিছু শেখা-জানাও আছে। মিশিরজী বোধ হয় বেছেবুছে তাকেই রেখেছেন ওই কারণে। মাথায় মাঝারি, স্বাস্থ্যবান লোক, মাথার চুল কিছু কিছু পেকে গেছে। সরসী তাকে টাকা পয়সা দিয়ে বাজারে পাঠাল। কাছাকাছি দোকান। মাটির হাঁড়ি, সরা, চাল ডাল তেল নুন, মায় মুরগীর ডিম, গুঁড়ো চা চিনি সবই হাজির করল ভকত্। বলল, লোটা, বাটলুই, খুন্তি এ বাড়িতেই সে যোগাড় করে রেখেছে। মায়জী হুকুম করলে বিকেলে সে আরও কিছু বাসনপত্র এনে দিতে পারে।

চেরা কাঠের আগুনে সরসী চায়ের জল ফুটোতে ফুটোতে ধোঁয়ার চোটে চোখের জলে একাকার হল। মাটির হাঁড়িতে ভাত বসল আর আলু সেদ্ধ। টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে ডিম, আলুর তরকারি হল।

যতিকিশোর খুব মজা পাচ্ছিল। বলল, "তুমি একেবারে অন্নপূর্ণা। কি বলে না, কথাটা যেন কি...ঠিক মনে পড়ছে না...বলো না, সেই কথাটা... মরুভূমিতে ফুল ফোটানো না কি যেন বলে...।"

সরসী ধমক দিয়ে বলল, "যাও, কুয়া থেকে জল তোলো গে যাও, চান করতে যেতে হবে আমায়।"

যতিকিশোর হেসে বলল, "চলো না, তুমি কুয়ার পাড়ে বসবে, আমি মাথায় জল ঢেলে দেব।"

সরসী আড় চোখে যতিকিশোরকে দেখল, বলল, "এতো ভালবাসা!"

যতিকিশোর শুধু হাসতে লাগল, কথা বলল না।

সরসীকে অবশ্য কুয়াতলায় স্নান করতে হল না। নীচের দিকের একটা ছোট কুঠরিতে স্নানের ব্যবস্থা করা ছিল। ভকত্ জল তুলে রেখেছিল ড্রামে। প্রাণভরে স্নান করল সরসী, আধখানা সাবান গলিয়ে সে যখন বেরিয়ে এল, মনে হল, কলকাতার ধুলো ময়লা যেখানে যা জমেছিল সব যেন পরিষ্কার করে ধুয়ে একেবারে টাটকা হয়ে সে বেরিয়ে এল।

দোতলার বারান্দার রেলিংয়ে ভিজে শাড়ি মেলে দিতে দিতে সরসী দেখল, যতিকিশোর ঘরে তার বিছানায় আরাম করে শুয়ে আছে।

দুপুরটা আলস্যেই কাটল। রাতটা ট্রেনে কেটেছে, শেষ দিকে সামান্য ঘুমিয়ে ছিল সরসী। যতিকিশোর সারাটা পথ চোখ চেয়ে বসে ছিল। দুপুরে ঘুম এসে চোখ এত ভারী করে তুলল যে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলে যতিকিশোর বলল, "কোন্ জায়গা থেকে শুরু করি বলো?"

সরসী বিরাট করে হাই তুলে জড়ানো ভারী গলায় বলল, "শুরু করি মানে?"

যতিকিশোর সরসীর দিকে তাকিয়ে থাকল, চোখের কোলে পাতলা হাসি, বলল, "লোকে কোথাও বেড়াতে গেলে একটা জায়গা থেকে শুরু করে...।"

"তুমিও করো তা হলে।"

"কোথা থেকে করি?"

সরসীর মাথার চুল পুরোপুরি শুকোয় নি, আঙুলে করে নাড়াচাড়া করছিল, পিঠের দিকে ছড়াচ্ছিল, বুকের ওপর টেনে নিচ্ছিল। বলল, "যেখান থেকেই করো একবার আমায় বাজারে যেতে হবে। ক'টা জিনিষপত্র না কিনলেই নয়।"

"তোমার শুধু সংসারের চিন্তা!"

"অন্য চিন্তা তুমি করো, আমার তো পেটের চিন্তা করতে হবে, না করলে তোমার আমার কারুরই চলবে না।"

"বেশ, যাব বাজারে। তার আগে?"

"বলো কোথায় যাবে? তোমাদের বাড়িটা দেখতে চলো।"

যতিকিশোর কথা বলল না, সরসীর মুখ দেখল, অথচ অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়ল, সে কি বলতে চাইল বোঝা গেল না।

সরসী বলল, "তোমাদের বাড়ি দেখতে গিয়ে পুরোনো কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। খুব অবাক হয়ে যাবে তোমায় দেখলে।"

যতিকিশোর বলল, "আমি কাউকে অবাক করতে আসি নি। কারও সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না।"

"বারে, তা কি হয়! শহরে ঘুরে বেড়ালে আমাদের দু'চার জন ঠিকই চিনবে। মানুষ কত আর পালটাতে পারে! একেবারে দাঁতপড়া বুড়োবুড়ি হয়ে এলে না হয় কথা ছিল...।"

যতিকিশোর অখুশী মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "এমন একটা উপায় যদি থাকত কেউ আমাদের চিনবে না?"

সরসী হেসে ফেলে বলল, "মন্ত্রটন্ত্র জানা থাকলে চেহারাগুলো পালটে নেওয়া যেত, তা যখন নেই, উপায় কি! আমি বরং মাথায় বড় করে কাপড় দিয়ে, নিজেকে খানিকটা লুকোতে পারি! তুমি কি করবে?"

যতিকিশোর কোন জবাব দিল না। সে এক জায়গায় নিজেকে লুকোতে চাইছে, আর-এক জায়গায় নয়। তার ইচ্ছে নয় শেরপুরে কেউ তাকে চিনে ফেলুক। এই ভয় তার আছে, কেননা এত বড় শহরটার সকলেই তো মরে যায় নি বা শহর ছেড়ে পালায় নি। কেউ কেউ নিশ্চয় আছে, বাবার চেনা-জানা দু' পাঁচজন বুড়ো, যতিকিশোরের পুরোনো বন্ধুবান্ধব সঙ্গীদের কেউ কেউ, কিংবা তার চেয়ে ছোট, মতির বন্ধুটন্ধু যারা তাকে একসময়ে যতিদা বলে ডাকত। এদের কাছ থেকে একেবারে লুকিয়ে থাকা কি সম্ভব হবে? হয়ত হবে না। কিন্তু আগাগোড়া সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। নয়ত, গণেশবাবুর এই বাড়িতে সে উঠবে কেন? কেন হোটেলে কিংবা ডাকবাংলোয় যাবে না?

সরসী বলল, "মিশিরজী যে বিকেলে খবর নিতে আসবেন বলেছেন!"

"কাজের লোক, সময় পেলে একবার আসবেন। আমরা থাকতে থাকতে না এলে আজ দেখা হবে না।"

"কখন বেরুবে?"

"তৈরী হয়ে নাও, আর খানিকটা পরেই বেরুবো, বিকেল পড়লেই।"

বিকেল পড়ে এলে যতিকিশোররা বেরিয়ে পড়ল। মিশিরজী আসেন নি। ভকত্ থাকল। সে সারা দিন-রাতই থাকবে এ বাড়িতে, কাছের গাঁয়ে তার বাড়ি। দুপুরে তার বউ এসে ঘুরে গেছে। ভকত্ কেরোসিন তেল যোগাড় করে এনেছে লণ্ঠন জ্বালাবে, বলেছে কাল কয়লা আনবে চুলা ধরাবার জন্যে, আরও কিছু কিছু জিনিস যোগাড় করে আনবে।

গণেশবাবুর এই বাড়ি শহরের পশ্চিমে, একেবারে শেষ প্রান্তে। আধ মাইলটাক হাঁটলে শহরের সীমানা ধরা যাবে, এই রাস্তাটুকু ফাঁকাই বলা যায়, দু' একটা দেহাতী বাডি রাস্তার ধার ঘেঁষে—, কয়েক ঘর বসতি, সেই পুরোনো হনুমান মন্দির, বটগাছের তলায় বাঁধানো চাতাল, গাছপালা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে কোথাও কোথাও, এক সময়ে আরও ঘন হয়ে ছিল দেবদারু আর শিরীষ গাছে। সূর্য যেন ডুবতে চলেছে, রোদ নেই, আকাশ খুব ফিকে রোদের আভায় এখনো সামান্য লালচে দেখাচ্ছিল।

সরসী হাঁটতে হাঁটতে বলল, "এই দিকটার খুব কিছু অদলবদল হয় নি।"

"সামান্য।"

"কেন বলো তো?"

"এ দিকে জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই। তা ছাড়া, শহরের বড় রাস্তা, স্টেশন, ব্যবসাপত্র সবই উলটো দিকে পড়েছে। এ দিকে কে আসবে?"

বাতাস বড় মোলায়েম ও ঠাণ্ডা হয়ে বয়ে যাচ্ছিল। রাস্তাটা এখন আর পুরোপুরি কাঁচা নেই; পাথরের টুকরোর সঙ্গে অল্প পিচও যেন জড়িয়ে আছে। গর্তটর্ত তেমন চোখে পড়ছিল না। একটা বয়েল গাড়ি ফিবে আসছে।

"শশি?"

"উঁ!"

"এই রাস্তা দিয়ে আমরা আগে কতবার জঙ্গলে পিকনিক করতে গিয়েছি। শীতকালে এইসব মাঠে কত আমলকি আর আতাগাছ দেখতাম।"

"কেন, মনে নেই, মহুয়া গাছও ছিল!"

কত কাল আগে দেখা সেই আমলকি, আতা, মহুয়ার ছবি যেন স্মৃতি থেকে পাতলা ধোঁয়ার মতন উঠে এসে যতিকিশোরকে উদাস করে দিল।

"সেবারের কথা মনে আছে তোমার?" সরসী শুধলো।

"কোন্ বার?" অন্যমনস্কভাবে যতিকিশোর বলল।

“গরুর গাড়ির চাকা খুলে গেল, রাধাপিসি একেবারে রাস্তায়...”

মনে পড়ে, এমন করে মনে পড়ে যেন যতিকিশোর হাত বাড়িয়ে তার নাগাল ধরতে গিয়েও পারে না। এসব একেবারে ছেলেবেলার কথা, যখন যতিকিশোরের বয়স ছিল আট-দশ, বড়দের সঙ্গে পিকনিক করতে যেত, নিজের আলাদা কোন অস্তিত্ব ছিল না, গাছের ভাঙা ডাল হাতে করে গরুর গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটত, চেঁচাত, বন্ধুদের সঙ্গে লাঠি খেলত ভাঙা ডাল নিয়ে, আর শীতের কড়া বাতাস ও মাঠের ধুলো খেয়ে মুখের গালের চামড়া কালো করে বাড়ি ফিরত। সরসী তখন আরও ছোট। সেই সরসী যেন তখন পিদিমের শিখার মতন, ছিপছিপে, মাথায় বাড়ছে, ঘষা রঙ গায়ের, চোখ মুখ নাক ধারালো, টকটক করে কথা বলে, বিনুনি দুলিয়ে তেড়ে ঝগড়া করে, গলার স্বর ফলার মতন কানে বিঁধে যায়, হাতে বোনা মোটা সোয়েটার পরে, মোটা মোটা জুতো পায়ে যতিকিশোরদের সঙ্গে সমান তালে লাফাতে লাফাতে চলে, কখনও ঝগড়া করছে, কখনও রাস্তা থেকে ধুলো বালি কুড়িয়ে মুখে ছুঁড়ে দিচ্ছে, কখনো বা মুখ ভেঙিয়ে বলছে: কাঁচকলা খা কাঁচকলা খা, এই হনুমান কাঁচকলা খা।

যতিকিশোর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

সরসী হাসছে। তার নীলচে শাড়ির আঁচল কোমরের কাছে জড়ানো, বাতাসে পিঠের দিকটা ফুলে যাচ্ছে, এলোমেলো করে জড়ানো চুলের ওপর গোধূলির এক টুকরো আলো যেন জলবিন্দুর মতন চিকচিক করে কোথায় মিলিয়ে গেল। তারপর ঝাপসা।

“কি হল, হাসছ?”

আর-এক দমক হেসে সরসী বলল, “এই রাস্তাটা তোমাদের সাইকেল চড়ার জায়গা ছিল, তাই নয়?”

যতিকিশোর মাথা নাড়ল। হ্যাঁ—ছিল। তখন নতুন নতুন সাইকেল শেখা হয়েছে। কোনো রকমে দুটো সাইকেল যোগাড় করে চার-পাঁচজন বন্ধু মিলে পালিয়ে এসেছে এদিকে। কে কত জোরে চালাতে পারে, কে কত ধীরে, কে এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে পারে, কে বা দু' হাত ছেড়ে—এই সব বাহাদুরী দেখানো হত।

সরসী বলল, “তুমি আমায় এখানে সাইকেল চড়া শেখাতে এনেছিলে মনে পড়ে?”

এক-আধবার হয়ত এনেছে যতিকিশোর। বন্ধুদের অনেককেই এখানে এনে তারা সাইকেল চড়া শিখিয়েছে। সরসীকেও এনেছিল বোধ হয়। “তুমি সাইকেল শিখেছিলে?”

“না। তোমাদের সাইকেলে আমি উঠতে পারতাম না, পা পৌঁছত না আমার। ...তা ছাড়া তুমি একদিন ভীষণ অসভ্যতা করেছিলে।”

"অসভ্যতা?" যতিকিশোর ঘাড় ঘুরিয়ে সরসীর দিকে তাকাল।

একটু চুপ করে থেকে সরসী বলল, "মনে পড়ছে না?"

"না।"

"তা হলে থাক্...."

"থাকবে কেন, বলো...।"

সরসী বলল না। বরং হাত তুলে সামনের দিকে দেখিয়ে বলল, "ওই দেখো, সেই বরফ-কলের বাড়িটা।"

যতিকিশোর তাকাল। ঝাপসা ভাব আরও গাঢ় হয়ে প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। আর সামান্য এগিয়ে লোকালয় শুরু হয়ে যাবে। সোজা এগিয়ে গেলে এক জায়গায় তেমাথার মোড়। ডান দিকের রাস্তাটা চলে গেছে যতিকিশোর আর সরসীদের বাড়ির দিকে। সোজা রাস্তাটা গিয়েছে নীচু বাজারের দিকে। আর বাঁ দিকে হাঁটলে পুরোনো রেল পাড়ায় পেঁাছে যাওয়া যাবে।

রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠল এতক্ষণে। শেরপুরে এখন ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে—আগে জ্বলত না। রেলের অফিসার বাংলো, আর স্টেশনের ধারেকাছে ছাড়া কোথাও ইলেকট্রিক জ্বলত না। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির টিম্‌টিমে বাতি জ্বলত, তাও প্রায় সিকি মাইল অন্তর।

এখন ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে লোহার থামের গায়, কিন্তু বাতিগুলোর জোর নেই, মিটমিট করে তাকিয়ে আছে, সব ক'টা আবার জ্বলছেও না, মাঝে মাঝেই খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সরসী বলল, "আগে আমাদের পাড়ায় যাব, কি বলো?"

যতিকিশোর কিছু বলল না। গম্ভীর ভাবে চারপাশ লক্ষ করতে লাগল। বরফকল বাড়িটার চেহারা একেবারেই পালটে গেছে। তার পাঁচিল ছোট হয়েছে, বড় বড় লোহার গেট উধাও। পাঁচিলের গায়ে করবী আর কলকের ঝোপ ছিল বরাবর। এখন গাছপালা নেই, একতলা টানা বাড়ি হয়ে গেছে পাঁচিল ঘেঁষে, শুধু হলুদ রঙের সেই মাঝখানের বড় বাড়িটা, যেখানে বরফকলের কাজ হত, সেটা এখনও রয়েছে। বরফকল যে উঠে গেছে বোঝাই যায়।... যতিকিশোর অপরিচিতের মতন চারপাশে তাকাতে লাগল। রাস্তা প্রায় কোথাও ফাঁকা নেই। বাড়ির গায়ে বাড়ি। বাতি জ্বলছে, কেমন একটা হল্লার মতন শব্দ, রেডিয়ো বাজছে জোরে জোরে, এলোমেলো দোকান, রিকশা আসা যাওয়া করছে, চাপা গন্ধ। একেবারে ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছে জায়গাটা; আগে ফাঁকা ছিল, মনোহরবাবুর বাড়ি, তেলের ডিপো ছাড়া কিছু ছিল না।

যতিকিশোরের মনে পড়ল, এইখানে শহরের একটা বড় ঘটনা ঘটেছিল। শেরপুরের ইতিহাসে নিশ্চয় বড় ঘটনা। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় প্রথম খুন এইখানেই হয়েছিল, তেল ডিপোর পাশে। সকালে খবরটা রটে যাবার

পর সারা শহর থমকে গিয়েছিল। তারপর একই দিনে চার-পাঁচটা খুন-জখম মহল্লায় মহল্লায় লাঠি, বল্লম, ছুরি নিয়ে সবাই তৈরী হতে লাগল। পুলিশ ঘুরতে লাগল চারপাশে। যমুনা বলে একটা ছেলে ছিল, যমুনাপ্রসাদ, সে তার দলবল নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগল, কাগজ বিলোতে লাগল।

সরসী যতিকিশোরের হাতের কাছটায় হাত রেখে টানল, "একটু নেমে হাঁটো; রিকশাগুলো কি করে চালাচ্ছে দেখছ না, ঘাড়ে পড়বে।"

রাস্তার পাশে নেমে এল যতিকিশোর। সেই বুড়ো বটগাছটা এখনও আছে। কী বিশাল হয়ে গেছে। তার শাখাপ্রশাখা অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে; যেন যতিকিশোরদের এতকাল পরে এই পাড়ায় চোরের মতন ঢুকতে দেখছে।

সরসী বলল, "একটা রিকশা নেবে?"

"কেন?"

"এত হাঁটছ! তুমি তো বেশী হাঁটতে চাও না। যদি পেটে ব্যথাট্যথা হয়!"

"না; ঠিক আছে। ফেরার সময় রিকশা নেব।"

তেমাথার মোড়ে পেঁছে সরসী ডান দিকের রাস্তা নিল। তাদের পুরোনো পাড়ার পথ। সরসীদের বাড়ি পড়বে পুবের সরু গলি দিয়ে ঘুরে এলে, এই রাস্তা সিধে যতিদের বাড়ির গায়ে গিয়ে পড়েছে।

কিছুই আর চেনা যায় না। বাড়িতে বাড়িতে ঠাসা। পর পর কত দোতলা তেতলা বাড়ি হয়ে গিয়েছে, গলি আরও সরু, সেই কাঁচা নর্দমা, রাজ্যের কুকুর জুটেছে, মিটমিট করছে আলো, সাইকেল রিকশা যাচ্ছে আসছে অনবরত, মানুষজন আসা-যাওয়া করছে, বাতাস আটকানো গন্ধ, পানের দোকানে ভিড়, টিউবলাইট জ্বলছে, রেডিয়ো বাজছে, হাসি-তামাশার কলরব, একটা মোটর গাড়ি বেরিয়ে আসছিল গলি দিয়ে মানুষজন আর রিকশার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

সরসী বলল, "কি হয়ে গিয়েছে গলিটা, পা ফেলার জায়গা নেই।"

সত্যিই নেই। এমন গায়ে গায়ে ঠাসা বাড়ি তখন ছিল না। দোতলা বাড়িই বা ক'টা ছিল। বাঙালী পাড়ার চেহারা আর খুঁজে পাওয়া যায় না, রাস্তার গা ঘেঁষে এত পান, মুদি, স্টেশনারি দোকানও ছিল না। অনেক ফাঁকা ছিল, পোড়ো জমি ছিল, গাছপালা ছিল। সেসব আর নেই।

"শশি, ওই বাড়িটা গোপেন কাকার ছিল না?" যতিকিশোর বলল।

সরসী দেখল। মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, গোপেন কাকার। তার পরেরটা ছিল মোহনদের।"

যতিকিশোর বেশ বুঝতে পারছিল, তারা এবার পাড়ার মাঝামাঝি এসে গেছে। আর সামান্য এগুলেই যতিকিশোরদের বাড়ি।

এবার যতিকিশোর নিজের বিচলিত ভাবটা বোধ করতে পারল। বিচলিত, না ভয়? যতিকিশোর কি ভয় পাচ্ছে? নাকি সে অসম্ভব চঞ্চল হয়ে ওঠার

জন্যে তার হৃৎপিণ্ড ক্রমশই দ্রুত হতে শুরু করেছে? হাত পা যেন কাঁপছে। কপালে, গলায়, হাতে ঘাম অনুভব করছিল যতিকিশোর। সে কি উত্তেজিত? কোনো আবেগ কি তাকে অস্থির করে তুলেছে? না। যতিকিশোর বেশ বুঝতে পারল সে ভয় পাচ্ছে, তার অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।

আর খানিকটা এগিয়ে যতিকিশোর যখন পুরোপুরি অন্যমনস্ক, সরসী হাত বাড়িয়ে আচমকা বলল, "ওই তোমাদের বাড়ি।"

যতিকিশোর দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথমে চোখে যেন সে কিছুই দেখতে পেল না। কাছাকাছি আলো নেই, এখানে একটা পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন কাজ হচ্ছে, ভাঙা ইট সুরকি পড়ে আছে, গন্ধ উঠছিল। যতিকিশোর যেন ঝাপসা চোখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকল। সেই 'শান্তি ভবন'। ঠাকুরদার নিজের হাতে তৈরী। একসময় সবই ছিল—সমস্ত পূর্ণ ছিল। শান্তি? তাও ছিল। আজ কি আছে? পাঁচিলটা আছে। ডালিম গাছটাও রয়েছে একপাশে। ভীষণ ময়লা কালচে দেখাচ্ছিল বাড়িটা। পাতলা জ্যোৎস্না উঠছে এতোক্ষণে। দোতলার কোণার ঘরে জলের মতন জ্যোৎস্না লেগেছে। ওই ঘরে ঠাকুমা মারা গিয়েছিল। সেই বুড়ি-ঠাকুরমা, কাশীর পেয়ারার মতন যার গায়ের রঙ, চাঁদের মুখের গড়ন, সেই ঠাকুমা যেন এখনও অন্ধকারে কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতিকিশোরকে এতকাল পরে দেখছে। ওই যে, যে-ঘরটায় বাতি জ্বালা রয়েছে—ওই ঘরে যতিকিশোর স্কুলে ছোরা মারামারি করে এসে অঘোর জ্বরে শুয়ে ছিল, শর্মা ডাক্তার ওই ঘরে তার পায়ের ফোড়া কেটেছিল, ওই ঘরে সে অসুখ-বিসুখের সময় শুয়ে থাকত, পাশের ঘরটাই ছিল মা'র।

যতিকিশোর তার ভয়, অস্বস্তি, আবেগ নিয়ে নিজের বাড়িটা দেখতে লাগল। যতিকিশোরের কাছ থেকে কত তফাতে সরে গেছে বাড়িটা, অথচ এই বাড়ি এখন তার শৈশব কৈশোর যৌবনকে জড়িয়ে যে মুহূর্তগুলি সৃষ্টি করছিল, সেই অসংখ্য মুহূর্ত বৃষ্টির ঝাপটার মতন তার চৈতন্যে এসে আছড়ে পড়ে তাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

যতিকিশোর অস্ফুটভাবে কি বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারল না, বাঁ হাতটা মুখের কাছে এনে হাতের মাংস কামড়ে ধরল।

৮

শেরপুর বদলে গেছে। যতিকিশোররা এমন আশা করে আসে নি যে তারা এতকাল পরে ফিরে গিয়ে সেই পুরোনো শেরপুর দেখতে পাবে। তবু এতটা অদলবদল যে ঘটে যাবে এ যেন ভাবতে পারে নি। এখন শেরপুরকে দেখলে মনে হয়, শহরটা যেন নিজেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে, বুঝতে পারছে না কোনদিকে সে ছুটে যাবে। পুবের দিকে ছিল রেল লাইন, স্টেশন, রেল কলোনি; সেদিকে যতটা পেরেছে, রেল লাইন টপকেও বেড়েছে, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। উত্তরের দিকটায় ছিল শেরপুরের আদি বসতি, সেই দিকটাও মাইল খানেক বেড়ে থেমে গিয়েছে। আর দক্ষিণ-পশ্চিম ঘেঁষে অভ্র, তারও পেছনে কয়লা খনি। এক যা শহরের পশ্চিম দিকটা বিশেষ ছড়াতে পারে নি অপ্রয়োজনীয় বলে। লোকজন কত বেড়েছে তার হিসেব যতিকিশোরের পক্ষে করা সম্ভব হল না, হয়ত চার গুণ, হয়ত ছ' গুণ। বাড়ি যেন অসংখ্য, পাকা বাড়ি, কাঁচা বাড়ি, ব্যবসাদারদের গদি আর গুদোম, ছোট ছোট কারখানা, একটা বড় ধরনের কাচকল চালু হয়েছে। দোকানপত্রে তামাম শহর ঠাসা। রাত্রে জেল্লা মারে আলোর বহরে। সিনেম চলছে দু' দুটো, পুরোনোটা রেলবাবুদের কলোনির কাছে দীন চেহারা নিয়ে পড়ে আছে। নতুন স্কুল হয়েছে বাজারপটির পাশে, আর-একটা হয়েছে রাজবাড়ির গায়ে, রাজবাড়ির বারো আনাই এখন কলেজ আর মেয়ে কলেজের সম্পত্তি।

এতরকম অদলবদল সত্ত্বেও যতিকিশোর আর সরসী তাদের পুরোনো শেরপুরের অনেক কিছুই খুঁজে পেল: নিজেদের পৈতৃক ঘরবাড়ি, সেই পাড়া, রাস্তাঘাট, সেই বাজার, বারোমেসে কালীবাড়ি, শিবমন্দির, দুর্গাস্থান, জুবিলী স্কুল, সরসীদের তারাসুন্দরী গার্লস স্কুল, আরও কত কি। অবিকল যেভাবে তারা রেখে গিয়েছিল সেভাবে নয়, সময় তার চেহারার অনেক অদলবদল করেছে, তবু সেই আদলটা থেকে গেছে এখনও।

যতিকিশোর তাড়াহুড়ো করল না। তাড়াহুড়োর দরকার ছিল না তার, সে নিজের পুরোনো শহরে শখ করে দু' একটা দিনের জন্যে বেড়াতে আসে নি।

যতিকিশোর জানে, অতীত আর ফিরে আসে না, তার সেই বাল্য, কৈশোর, প্রথম যৌবন আর ফিরে আসবে না। তবু কিছু আসে, নিজের অনুভূতির মধ্যে আবার। কিছু সময়ের জন্যে তা জীবন্ত, প্রত্যক্ষ, সত্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই কি নয়? সরসীকে যতিকিশোর একটা তুলনা দিয়ে বুঝিয়েছিল, অতীত কেমন করে জীবন্ত ও সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ধরে নেওয়া যাক, যতিকিশোর সরসীকে বলেছিল, ধরে নেওয়া যাক—তোমার কিংবা আমার ছেলেবেলার একটা ছবি পাওয়া গেল। সেই ছবি তোমার, কচি মুখ, মাথা ভরা চুল, গায়ে ফ্রক, পায়ে জুতোমোজা, হাতে একটা কাগজের পাখি। সেই শশী আর আজকের সরসী কখনোই এক নও, দশ বছরের শশী আর সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছরের সরসীকে কেউ এক বলবে না। কিন্তু সেই ছবিটা যখন তোমার হাতে আসে শশি, তখন—তুমি কাকে দেখো, তোমার সাঁইত্রিশ বছরের চেহারাটা, না দশ-এগারো বছরের মুখটা? কোন্ সরসীকে ভাব? এখনকার না তখনকার? মনের মধ্যে যে ঘুরে বেড়ায় সে সরসী কোন্ সরসী? আমি ছেলেবেলায় দেখেছি, আমার ঠাকুরমার অভ্যেস ছিল নিজের বিয়ের ছবিটা মাঝে মাঝেই তন্ময় হয়ে দেখা। ঠাকুরদার প্যাগড়ি পরা লম্বা চেহারার পাশে চেযারে বসা তেরো-চোদ্দ বছরের ঠাকুমাকে খুকি খুকি দেখাত। শাড়ি গয়না নোলক পরে ঠাকুমা চেয়ারে বসে আছে, আর চেয়ারে হাত দিয়ে ঠাকুরদা দাঁড়িয়ে আছে—এ দেখে আমরা খুব মজা পেতাম। তখন বুঝতে পারতাম না, কিন্তু এখন বুঝি, আমাদের কাছে যেটা মজা ছিল, ঠাকুমার কাছে সেটা নিজের জীবনের একটা অংশ ছিল। ঠাকুমা ওই ছবি দেখতে দেখতে তার বিয়ের দিনগুলোর মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠত। তাই নয় কি?

সরসী এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইত না। শেরপুরে এসে তার ভাল লাগছিল। গণেশবাবুর কুঠিতে এসে ওঠার পর প্রথমটায় তার মন মুষড়ে পড়েছিল যতির অসুবিধের কথা ভেবে। দু' একদিনের মধ্যে সে অসুবিধে প্রায় আর কিছুই থাকল না। যা এখনও আছে—তা তেমন কিছু নয়, ওটুকু সয়ে নিতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না কারও। সরসী খুশী। সকালে ঘুম ভাঙলেই—কোনোদিন দেখে রোদ উঠে গেছে, কোনদিন খানিকটা মঘলা মেঘলা লাগে। যতি তখনও ঘুমোচ্ছে। সকালের শুভ্রতা আর টাটকা হাওয়ার স্বাদ মুখে মেখে নিয়ে সরসী দরজা খুলে বাইরে সরু বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। মকাই ক্ষেত বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে, এক জোড়া তিতির এসেছে পাঁচিলে, রোদ নামছে ধীরে ধীরে, কুয়াতলায় সাড়া শব্দ নেই, ঘাস আর গাছপালার গন্ধ যেন শরীরকে মোলায়েম, নরম, স্নিগ্ধ করে দিয়ে যায়। বাসি কাপড়, বাসি মুখ—তবু সরসী যতিকিশোরের গায়ে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেয়। যতি উঠে পড়ে, ঘুমের গলায় বলে, 'রোদ উঠে গেছে?' 'হ্যাঁ, এই উঠল। নাও মুখ ধুয়ে নাও, চা আনছি।' নীচে ততক্ষণে ভকত্ উঠেছে। কেরোসিনের স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরী করে

সরসী; ওরই মধ্যে কুয়াতলায় গিয়ে মুখ ধুয়ে আসে টাটকা জলে। চা নিয়ে ওপরে আসে যতির ঘরে। যতি মগের মতন বড় একটা কাপে চা খায়, খেতে খেতে কথা বলে, কাল রাত্রে মেঘ ডাকছিল শুনেছ? আমি ভাবলাম বৃষ্টি আসবে। তোমায় একবার বলে দেব ভাবলাম। এখানে আরও বৃষ্টি হবে, মাঝে মাঝেই মেঘলা হচ্ছে দেখছ না?

সকালটা এমনি করেই কাটে। সরসী যতিকিশোরের বিছানা গুছোয়, সিগারেটের ছাই আর টুকরো পরিষ্কার করে, গেঞ্জি রুমাল কাচতে দেয় সাবানে, গল্প করে, হাসিখুশীর কথা, যতি নানান তামাশা করে, নীচে ভকত্ চুলা ধরিয়ে বাজারের দিকে চলে যায়। সরসী নিজের ঘর গুছিয়ে নীচে নেমে যায় কাজে।

শোবার ঘর নিয়ে প্রথম দিন একটু অসুবিধে হয়েছিল। যতির বিছানা হল তক্তপোশে, নেয়ারের খাটটা ঝেড়েঝুড়ে রোদে রেখে শোবার ব্যবস্থা যদিও করেছিল সরসী, তবু তার ইচ্ছে ছিল পাশের ঘরে শোবে। যতি বলল, তুমি এ ঘরেও শুতে পার, তোমার তো আলাদা বিছানা, বলে যতি হেসেছিল মুচকি। সরসী বুঝতে পারে নি, সে রাজী হবে কি হবে না। পাশের ঘরে একা শুতে তার ভয় এবং অস্বস্তি হচ্ছিল, অথচ যতির ঘরে শুতেও তার কোথায় যেন আটকাচ্ছিল। এখানে কোনো সামাজিকতার কথা ওঠে না, কে দেখল না দেখল তাও বড় কথা নয়, তবু সরসীর মনে হল, শোয়াটা থাক—, অন্য কোনো আড়াল তো সে যতির সঙ্গে রাখে নি, এটা তো শুধু আড়াল নয়, আত্মসম্মানও। যতিকে সে অবিশ্বাস করছে না এক বিন্দুও, যতির সম্মানও সে রাখছে।......প্রথম দিন পাশের ঘরে একলা শুতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত শোয়া হল না সরসীর। যতির ঘরেই শুতে হল।

সকালবেলা এবং দুপুরটা তাদের এই ভাবেই কাটে—গণেশবাবুর কুঠিতে বসে, শুয়ে-বসে গল্প করে, বাড়ির সামনে ঘুরে, ছোটখাট কাজকর্ম করে, বিছানায় তাস সাজিয়ে কথা বলতে বলতে।

যতি সকাল, দুপুর, এমন কি বিকেলের গোড়ায়ও শহরের দিকে বেরুতে চায় না। বলে, না, সন্ধ্যের দিকে বেরুবো, কে কখন চিনে ফেলবে, আমার ভয় করে, আমি তো তোমায় বলেছি—আমাদের কেউ চিনে ফেলুক আমি চাই না।

"তুমি কি চোর নাকি যে তোমার ভয় করবে?" সরসী রাগ করে বলেছিল।

"তা বলতে পার। চোরই।"

"তোমার যত অদ্ভুত কথা।"

"দিনের বেলায় কোথায় শহরের মধ্যে ঘুরবে! এতো রোদ আর ওই ঘিঞ্জির মধ্যে?"

কথাটা অবশ্য ঠিকই। শেরপুরের মাথার ওপর দিয়ে বর্ষার সব মেঘ চলে যায়

নি, এখনও কোথাও যেন কালো জলভরা মেঘের দল অপেক্ষা করছে। তবু এখানেও বর্ষার শেষ পালা এগিয়ে এসেছে, শরতের ছোঁয়া লেগেছে আকাশে, রোদ ঝলমল করছে, তাত রয়েছে যথেষ্ট, থেকে থেকেই ঘোলাটে হয়ে আসে আলো, গুমোট ওঠে।

সরসীর ইচ্ছে ছিল, পুরোনো মানুষদের কারও কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যেত। বড় দেখতে ইচ্ছে করে নটুকাকিমাকে। নটুকাকি কি বেঁচে আছে? নিজের ছেলেবেলার সখী আরতি, যার ছেলের সঙ্গে সরসী তার নাকবোঁচা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল তিনটে পুঁতির মালা কড়ার করে। কোথায় সেই আরতি? এখানে আছে না বিয়ের পর কোথাও চলে গেছে? যদি আরতি থাকত, চমকে যেত, চমকে যেত সেই বোঁচা মেয়ের মাকে দেখে। কেন, বাবাকেও দেখত। যতি বিয়ের সময় বাবা সেজেছিল। সেই বেচারী বাবার কি অবস্থা?

এ সব কথা মনে হলে সরসী রান্নাঘরের কাজ সেরে হাসতে হাসতে ওপরে উঠে আসে। যতি রাজার মতন বিছানায় শুয়ে পা নাড়াচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে আর সেই বিচ্ছিরী চেহারার মলাট-অলা বই পড়ছে।

সরসী এসে যতির হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে পায়ের দিকে ফেলে দেয়। "এই, একবার আরতির খোঁজ নেবে?"

"কে আরতি?"

"আমার বন্ধু। যাব ছেলের সঙ্গে আমার বোঁচা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম; তুমি মেয়ের বাবা হয়েছিলে......" সরসী আবার হাসতে লাগল।

যতিকিশোর শুয়ে শুয়েই বলল, "আর হব না।"

"মানে?"

"বাবা হবার বড় দুঃখ।"

"ইয়ারকি রাখো। আমার কিন্তু অনেককেই দেখতে ইচ্ছে করে। নটুকাকি, আরতি, অনুদি, মাধুরী, মামী, সেই তুলসী কাকা......"

"যাও দেখে এসো।. ..শুধু আমার কাছে কাউকে এনো না, বলো না আমি এখানে এসেছি।"

"কেন?"

"আমার কারও সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না।"

"তা হলে তুমি শেরপুরে এলে কেন!"

"নিজেকে দেখতে।"

"আর আমায় আনলে কেন?"

যতিকিশোর দু' মুহূর্ত সরসীর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "সেও আমাকে দেখতে।"

সরসী আর কিছু বলল না। একেবারে ছেলেমানুষ নয় সরসী, সে স্পষ্টই

বোঝে এ-শহরের পুরোনো কারুর সঙ্গে যেচে দেখা করতে যাওয়া তার পক্ষেও সম্ভব নয়। সে কেমন করে বলবে, যতিকিশোরের সঙ্গে সে শেরপুর বেড়াতে এসেছে, গণেশবাবুর কুঠিতে আছে দু'জনে, একই সঙ্গে খাওয়া বসা শোয়া করছে! যতিকে তুই বিয়ে করেছিস নাকি? ওমা, কবে করলি? তোর সিঁথিতে সিঁদুর কই? হাতে লোহা কই? ওই লোককে তুই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলি সরসী, যে তোদের শহরছাড়া করেছিল? যে তোর নামে কুচ্ছিৎ করে বলত!

সরসীর দুঃখই হয়, আহা এতকাল পরে এল যদি বা তবু তার কোনো উপায় নেই নিজে যেচে গিয়ে পুরোনো মানুষজনের সঙ্গে দেখা করে আসবে। একেই বল জালে জড়ানো। সরসী নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছে।

দিনটা সকালের দিকে খুব উজ্জ্বল হয়ে ছিল। রোদ ঝকঝকে। চারদিকের সবুজ যেন স্নিগ্ধ আভায় মনোরম হয়ে রোদ খাচ্ছিল। আকাশের মাথায় চিল উড়ে গেছে, নীচে মাঠে ঘাটে ঝাঁক বেঁধে ফড়িং নেমেছিল, বাতাস নরম, দূরের ক্ষেত-খামারের গন্ধ বয়ে আনছিল। দুপুরের দিক মেঘলা হয়ে এল। হালকা মেঘলা, রোদ আছে, নেই আবার খানিক রোদ ফুটল। আবার পাতলা ধোঁয়ার মতন মেঘলা হয়ে এল। বিকেলের দিকে গাঢ় মেঘলা। কালচে ছায়া নেমে গেল চারদিক জুড়ে।

বিকেলে চা খাওয়া শেষ করে সরসী বলল, "কি, বেরুবে?"

যতিকিশোর বলল, "কেন? বেরুবে না?"

"বৃষ্টি আসতে পারে।"

"নাও পারে।......কিছুই বলা যায় না।"

শেষ বিকেলে পথে বেরিয়ে সরসী দেখল, আকাশের রঙের তেমন কোনো ইতর বিশেষ হয় নি। ঘন মেঘলা। দিনের আলো এসময় একেবারে মরে যাবার কথা নয়, তবু আজ মেঘলার জন্যে অন্ধকারের ভাব এসে গিয়েছিল।

হাঁটতে হাঁটতে সরসী বলল, "আজ কোথায় যাবে?"

"বলো কোথায় যাই......।"

"স্টেশনের দিকে যাবে?......ছোট লাইনের গাড়ি দেখব......"

"চাঁদমারির মাঠে চলো, তার গা দিয়েই ছোট লাইনের গাড়ি যাবে।" বলে যতিকিশোর কি ভাবল, "সন্ধ্যের মুখে একটা গাড়ি যেত না? গোঁশালার কাছে থামত......"

"যেত। একটা যেত, একটা আসত। তারপর সেই রাত্তিরে।......এখন কি সময় করেছে গাড়ির কে জানে!"

যতিকিশোর বলল, "চলো, দেখি।......বোধ হয় এখনও যায়।"

"চাঁদমারির মাঠ কিন্তু দূর।"

"কত আর?"

"যদি বৃষ্টি আসে কোথাও দাঁড়াবার জায়গা পাব না। ভিজে মরব।"

যতিকিশোর হেসে বলল, "তুমি তো ছাতা সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়েছ।"

"আহা, এই মেয়ে-ছাতায় দু'জনের মাথাও বাঁচবে না।"

যতিকিশোর কিছু বলল না।

চাঁদমারির মাঠ খানিকটা দূরেই। যতিকিশোরদের পুরোনো পাড়া, মিউনিসিপ্যালিটির কাঁঠালতলার পাশ দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, সোজা পথে অনেক দূর। যতিকিশোর ঠিক করলে, পথ ছোট করে যাবে। আজকাল কাঁঠালতলার পাশ দিয়েও রাস্তা হয়েছে খানিকটা, বেহারীদের বসতি হয়েছে, ছোট ছোট খাপরার ঘর, গরুমোষের খাটাল। লোকালয়টুকু পেরিয়ে গেলেই সেই কবরখানা। পুরোনো কবরখানা। তারপর মাঠ ঢালু হয়ে নেমে গেছে বরাবর। ডান দিকে ছোট রেলের লাইন। দূরে জোড়া ফটক। জোড়া ফটকের কাছাকাছি চাঁদমারি। চাঁদমারির মাঠের ধরনটাই আলাদা। একেবারে সমতল বিশাল মাঠ, সামান্য দু' চারটে পলাশ গাছ ছিল আগে, নয়ত সারা মাঠ শুধু চোরকাঁটায় ভরা। মাঠের শেষে পাহাড়ের মতন একজোড়া বালিয়াড়ি। গায়ে গায়ে। একেবারে ছেলেবেলায় যতিকিশোররা বলত পাহাড়। পরে আর সে ভুলটা সংশোধন করে নি।

সরসী যতিকিশোরকে লক্ষ করছিল। কলকাতায় এই মানুষটা কত সাবধানী, জোরে জোরে হাঁটে না, উঁচুনীচু জায়গায় ভীষণ সাবধান হয়ে যায়, একটুখানি হাঁটাহাঁটির নাম শুনলেই মুখে অনিচ্ছা এবং কাতরতার ভাব ফুটে ওঠে। অথচ এখানে যতির হাঁটতে অনিচ্ছা নেই, তার সাবধানতাও কম, জোরে জোরে পা ফেলে। সরসীর ভয় হয়, এত হাঁটাহাটি করলে, এমন খামখেয়ালিপনা করলে যতির না আবার পেটে ব্যথা ওঠে।

জুবিলী স্কুল কম দূর নয়। ছেলেবেলায় যতিরা নীচু বাজারের পাশ দিয়ে ধোপাদের বস্তির ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে যেত। তাও কম করে সোয়া মাইলটাক। এখন রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে একটা আটাকল বসেছে, তার পাশে ছোট ছোট চাকি কল।...যতি জুবিলী স্কুল পর্যন্ত সারাটা পথ হেঁটে হেঁটে গেল। হেঁটে হেঁটে ফিরল। কি দরকার ছিল হাঁটবার? একটা রিকশা নিলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। কিন্তু কে নেবে রিকশা? রিকশা নিলে তো শুধু পথ পেরুনো হবে, এই যে হাঁটা, ধীরে ধীরে, কোথাও থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে, কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরোনো কিছু দেখতে পেয়ে বিহ্বল হয়ে যাওয়া, কোথাও বা পুরোনোকে ভেঙেচুরে নতুন কিছু গড়ে উঠেছে দেখে আফসোস করা মলিন মুখ করে বলা, 'দেখেছ, কী কাণ্ড! এখানে সেই নানকুর আচার মোরব্বার দোকান ছিল। পাঁপড় থাকত, হজমি থাকত, এলাচ দানা

থাকত। নান্‌কুর হজমি খেলে পাহাড় হজম হয়ে যেত। তোমায় কত খাইয়েছি বলো। তুমি মাইরি, আশ্চর্য লোক! সব ভুলে গেছ।'

সরসী হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেত না। কে বলেছে সরসী সব ভুলে গেছে? সে ভোলে নি। তবে কোথায় নান্‌কুর দোকান ছিল, তার হজমি চেটে চেটে কত খেয়েছে তাও কি সরসীর মনে রাখার কথা! না বাবা, তার অত তুচ্ছ, অত খুঁটিনাটি মনে নেই। তা ছাড়া এ তো ছিল তোমাদের চরে বেড়াবার রাস্তা, স্কুলের পথ; আমার তো নয়, আমার কেমন করে মনে থাকবে?

যতিকিশোরের এই সব ছেলেমানুষী দেখে প্রথমটায় সরসী মজা পেত, হাসত, ঠাট্টা করত। পরে দেখল, তার ভুল। যতি যেন সত্যি সত্যিই এখানে তার ফেলে যাওয়া ছোট বড় তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসটা পর্যন্ত কুড়িয়ে নিতে এসেছে। কী আগ্রহ নিয়ে. কত তন্ময় হয়ে সে দেখে, যেন নিজেকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দেয়। এখানে একটা সরু গলি ছিল মনে আছে? গলির প্রথমেই একটা কাচের দোকান ছিল, মার্বেল বিক্রী করত, চুড়ি বেচতো। দোকানটা নেই। গলিটাই বা গেল কোথায়? সরসী বেশ বুঝতে পারে, গলি বন্ধ হয়ে গেছে, তার মুখ অন্যদিকে সরে গেছে। রাজাবাবুর দোকানটা নেই দেখে যতির কত আফসোস। ভাদুড়িবাবুর মুদির দোকান হাত বদল হয়ে গিয়েছে, মাড়োয়ারী মস্ত দোকান হাঁকিয়েছে, যতি অসম্ভব চটে গেল। 'বাঙালীকে সবাই ঠকাচ্ছে, বুঝলে শশি, কোণঠাসা করে দিচ্ছে। দেখছ না, এই শহরে আমাদের সময় বাঙালী ছিল মাথায়, এখন তার কি অবস্থা? বাঙালী পাড়াটাই উঠে যাবার যোগাড়।' ...বারোমেসে কালীবাড়ির সামনে গিয়ে যতির যেন গায়ে জ্বর এল। কোথায় সেই লোকটা, যে খালি গায়ে লম্বা পৈতে ঝুলিয়ে বসে থাকত, যার হাত দুটো ছিল ভূতের মতন লম্বা, ফরসা রঙ গায়ের, হেঁড়ে গলায় মন্ত্র পড়ত? সেই লোকটা নেই; তার বদলে যে আছে সে বোধ হয় লোকটারই ছোট ভাই, সিদ্ধি বা গাঁজা খাওয়া চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এ-রকম একটা লোক তখন থাকলে যতি নিশ্চয় ঠাকুমার দেওয়া পয়সা পকেটে রেখেই ফুল বেলপাতা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত কালীবাড়ী থেকে। আসলে কালীবাড়িটা পালটে গেছে, তার মোজাইক করা মেঝে হয়েছে, কালীমূর্তি বসার জায়গাটা শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো হয়েছে, লোহার শিক দেওয়া দরজা পড়েছে মন্দিরের সামনে। সরসী কালীবাড়িতে পয়সা দিল। ফুলপাতা নিল। যতিকিশোরের মাথায় ছোঁয়াল।

জুবিলী স্কুলের সামনে গিয়ে যতি দেখল, ফটক বন্ধ, মাঠের ওপর বিশাল বিশাল শিশুগাছ ছিল, একটা মহানিম। নিমগাছটা আছে, শিশুগাছগুলো নেই। মাঠে দোতলা দালান উঠে গেছে। দেওয়ালের গা আলকাতরায় নোঙরা, বিশ্রী ভূতের মতন ছবি সব, স্লোগান লেখা, কোথাও

বাতি জ্বলছে না। যতি স্কুলের ফটকের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, যেন সে অনাহূত, জীবনে কখনো তার কোনো সম্পর্ক যে ছিল এখানে একথা কেউ স্বীকার করছে না, এক ওই মহানিমের গাছটা ছাড়া। যতির চোখমুখ থমথমে, বিষণ্ণ, গম্ভীব হয়ে গেল। মনে হল, তার চোখে জল এসে গেছে।

ততক্ষণে সরসীরা চাঁদমারির মাঠে এসে পড়েছিল। মাঠটা মোটামুটি সেই রকমই আছে। চোরকাঁটায় ভরতি। ফাঁকা হা হা করছে। উত্তরে ছোট লাইন চলে গেছে। তার সিগন্যাল জ্বলছে দূরে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। আকাশ মেঘে মেঘে ঘুটঘুটে হয়ে গিয়েছে। অনেক দূরে সেই বালিয়াড়ি, যতিরা যাকে পাহাড় বলত, যেখানে কোনোদিন বন্দুকের টিপ তৈরী করত সাহেবসুবোরা।

যতিকিশোর চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বলল, "সেই চাঁদমারির মাঠ!"

সরসী আকাশ দেখছিল। মেঘে মেঘে একাকার। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কেমন! সরসী বলল, "বৃষ্টি আসবে এখুনি।"

"আসুক।"

"ভিজে মরবে।"

"মরব।" যতিকিশোরের গলার স্বর একেবারে ছেলেমানুষের মতন। "চলো, পাহাড় পর্যন্ত যাই।"

"সে তো অনেকটা…।"

যতিকিশোর হাত ধরে টানল।

সরসী হাঁটতে লাগল পাশে পাশে। দমকা বাতাস এল। বৃষ্টির বাতাস। ছোট লাইনের গাড়ি আসছে, হুইসিল বাজল, সিগন্যালটা সবুজ হয়ে গেল। যতিকিশোর সরসীর হাত টেনে জোর পায়ে হাঁটতে লাগল, যেন দৌড়চ্ছে। কি যে করে যতি? কোথায় একটা পাথর-টাথর আছে, হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে! 'আস্তে আস্তে, কি করছ? কোথাও পড়েমড়ে যাবে!' যতি সত্যিই ছুটতে শুরু করল। 'গোশালার দিকে গাড়ি যাবে শশি, ওই তো ইঞ্জিনেব আলো…।' সরসী কি পারে? তার শাড়ি চোরকাঁটায় ভরে গেল। মস্ত মস্ত ঘাস হয়ে গিয়েছে মাঠে। বাতাস প্রবল হয়ে গেল। বৃষ্টি এল বলে। বিশাল করে বিদ্যুৎ চমকালো। সরসীর হাত-ব্যাগের মধ্যে টর্চ আছে, বের করার অবসর পাচ্ছে না। এই অন্ধকারে শুধু ছুটছে। তার আঁচল উড়ছে, পায়ে চোরকাঁটা ফুটছে।

"শশি, গাড়ি আসছে। ওই যে…"

ছোট লাইনের আপ গাড়ি আসছিল। ছোট এঞ্জিন। দুটো মাত্র বগি। জানালা দিয়ে আলো এসে লাইনের পাশে পড়ছে, পড়তে পড়তে ছুটছে, আলো

আর ছায়া ছুটছে।

যতিকিশোর লাফ দিয়ে উঠে অন্ধকারে হাত নাড়তে লাগল। লাফাচ্ছে আর হাত নাড়ছে। ছোট লাইনের গাড়ি রেল লাইন কাঁপিয়ে, সারা মাঠে তার ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ প্রতিধ্বনিত করে ঝড়ের বেগে চলে যাচ্ছে গোশালার দিকে। আর যতি-কিশোর অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলছে: 'আমি এখানে, আমি এখানে...আই অ্যাম হিয়ার।'

ধমক দিয়ে সরসী বলল, "কি হচ্ছে! তোমায় ওরা দেখতে পাচ্ছে? শুধু শুধু লাফাচ্ছ?"

যতিকিশোর ছেলেমানুষের মতন হাসল। "না পাক্‌...।"

"চলো, আর নয়।"

"মানে?"

"বৃষ্টি এসে গেছে। আকাশটা দেখছ!"

যতিকিশোর আবার টানল সরসীকে। "ওই পাহাড় পর্যন্ত..."

"আমি হাঁটতে পারছি না, চোরকাঁটায় পায়ের দিকের শাড়ি ভরে গেছে।"

"পারবে পারবে..."

যতিকিশোর কিছু শুনবে না। টেনে নিয়ে চলল।

তার আগেই বৃষ্টি এসে গেল। অন্ধকার থেকে বর্শার ফলার মতন জলের ঝাপটা এসে লাগল। আকাশ জুড়ে গুরুগুরু মেঘ ডাকল, বিদ্যুৎ ঝলসালো মাথার ওপর, আবার মেঘ ডাকল।সরসী কোন রকমে ছাতাটা খুলল। কার সাধ্য সে ছাতা ধরে রাখে, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিকষ অন্ধকারের মধ্যে যুগলে ভিজে স্নান করে গেল।

যতিকিশোর হাসছে। সরসী প্রাণপণে চেষ্টা করছে ছাতাটা মাথার ওপর ধরে রাখার।

"ছাতাটা ধরো, উড়ে যাবে।"

"যেতে দাও।"

"বাঃ!"

এই অন্ধকার আর বৃষ্টিতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সরসী হাতব্যাগ থেকে টর্চটা বের করতে চাইল, যতিকিশোর বের করতে দিল না। সরসীর কাঁধের কাছে মাথা নুইয়ে, সরসীকে জড়িয়ে ফিরতে লাগল যতিকিশোর।

"শশি?"

"উঁ!"

"চাঁদমারির মাঠে তোর সঙ্গে অনেক ছোটাছুটি করেছি। অনেক বৃষ্টিতে ভিজেছি..."

সরসী অনুভব করতে পারছিল যতি তার কৈশোর যৌবনে ফিরে গেছে।

যতির সর্বাঙ্গে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে, নাকি রোমাঞ্চ? তার শরীরের সমস্ত স্পন্দন, তার আকর্ষণ, তার মাথা নুইয়ে সরসীর গলার পাশে ছুঁইয়ে রাখা, সবই যতিকে কোন যৌবনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, তখন তো সরসী 'তুই' ছিল।

"শশি, ওই দেখ্ এবার ছোট লাইনের ফিরতি গাড়ি আসছে।"

"আসুক..."

"হাত নাড়বি?"

"তুই নাড়।...চোরকাঁটায় আমার পা কেটে যাচ্ছে।"

"তোর পা মোম দিয়ে গড়া নাকি রে?"

"হ্যাঁ, মোম দিয়ে।"

যতিকিশোর হাসতে লাগল।

"শশি, এই মাঠে আমরা সন্ধ্যাবেলায় তারা গুনতাম।"

"মেঘে আঁকা বড় বড সারস পাখি দেখতাম।"

"ভাল্লুকের মুখ দেখতাম।"

"ভূতের ভয় পেতাম..."

যতিকিশোর আবার হেসে উঠল। ফিরতি গাড়িটা সত্যিই আসছে। এঞ্জিনের আলো পড়ে বৃষ্টি আরও প্রবল দেখাচ্ছে, রেল লাইন আর মাঠ ধবে ছুটে যেতে যেতে সার্চ লাইটের আলো তলোয়ারের ফলার মতন অন্ধকার চিরে দিচ্ছে। বগির জানালা বন্ধ, আলো আসছে না।

বৃষ্টিতে বাতাসে শীত ধরে গিয়েছিল সরসীর। সে কাঁপছিল। যতিকিশোরও কাঁপছে।

ফিরতি গাড়ি বাঁশি বাজিয়ে মাঠঘাট কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছিল।

যতিকিশোর বলল, "এখানে কোথায় একটা চালা ছিল না।"

"দেখেছিলাম। এখন আর দেখতে পাচ্ছি না।"

সরসীব হাতের ছাতা উড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে হাতের মুঠোয় থেকে গেল।

"ছাতাটা এবার যাবে..." সরসী বলল।

যতিকিশোর কিছু বলল না। সমস্ত মাঠ অন্ধকার, বৃষ্টি, বাতাসেব ঝাপটা, চোরকাঁটা আর এই সরসী আর সে, জলে স্নান করে কাঁপতে কাঁপতে কোন্ এক সুখের কাছে চলেছে সে তা অনুভব করছিল।

৬

দোকানের সিঁড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এল যতিকিশোর। নেমে এসে ডাইনে বাঁয়ে তাকাল। একটাও রিকশা নেই; সবচেয়ে কাছে যেটা দাঁড়িয়ে আছে সেটাও 'দেশবন্ধু' সাইকেল স্টোর্সের কাছে। ঠিক মুখোমুখি নয়, তবে উলটো দিকে একটা পায়ে চলা গলি আছে, দুজন মানুষ বড় জোর পাশাপাশি হাঁটতে পারে। গলিটা চাঁদিপট্টি, তুলোবাজার দিয়ে ঘুরে ঘুরে খুবই খারাপ একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছে, তারপর ডান হাতি পাক খেয়ে পুরনো রাজবাঁধে।

কোন্ দিকে এগুবে বুঝতে না পেরে যতিকিশোর সামান্য ইতস্তত করল। রিকশার দিকে এগুতে হলে লোকটা তাকে দেখে ফেলবে এবং ধরে ফেলবে। কেননা রাস্তায় এমন একটা ভিড় নেই যে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। যতিকিশোর উলটো দিকের গলিটাকেই নিরাপদ মনে করে তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরুলো। সে অবশ্য এখন এই গলিটার সব কিছু মনে করতে পারছে না। তাতে কি? নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আপাতত ওই গলিই তার অবলম্বন।

গলিতে ঢুকে পড়ার মুখেই যতিকিশোর তার কাঁধে কার হাতের স্পর্শ অনুভব করল। স্পর্শটা মোলায়েম নয়, বেশ জোরেই কাঁধ ধরে ফেলেছে লোকটা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল যতিকিশোর।

লোকটা এবারও তাকে নজর করে দেখল। "যতি না?"

যতিকিশোর এমনভাবে তাকাল যেন সে যতি নয়, এবং যতি যে কে সে জানে না।

"দোকানে তখন থেকে দেখছি, ভাবছি—চেনা মুখ, খুব চেনা মুখ—; আর তুমি দেখেও দেখলে না?"

যতিকিশোর বেশ বুঝতে পারল, সে ধরা পড়ে গিয়েছে। পালিয়ে যাবার চেষ্টা অকারণ। সেটা আরও হাস্যকর হবে। যেন তখনও লোকটাকে চিনতে পারছে না—বিস্ময় এবং কিছুটা সঙ্কোচের ভান করে যতিকিশোর বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না..."

"আমি বাসুদেব।"

"ও! আচ্ছা।"

"আচ্ছা মানে! চিনতে পারছ না এখনও?"

যতিকিশোর বাসুদেবের চোখের দিকে তাকাল। অচেনা বা অল্প চেনার ভাব করে লাভ নেই, তাতে বাসুদেবকে এড়ানো যাবে না। যতিকিশোর হঠাৎ বাসুদেবের হাত ধরে ফেলে সাদরে সম্ভাষণ করার মতন চাপ দিল। "আরে, বাসু! বাসুদেব নন্দী...! সত্যি, আমি প্রথমটায় কেমন সব গুলিয়ে ফেলেছিলাম।"

বাসুদেব যতিকিশোরের হাত উঠিয়ে নিয়ে বুকের কাছে ধরে পুরেনো বন্ধুত্বের খুশী জানাতে লাগল। "তোমাকে দোকানে দেখে আমারও কেমন সন্দেহ সন্দেহ হচ্ছিল! হবারই কথা, কতকাল পরে দেখা, বলো!"

"অনেক কাল। আফটার এ লং—লং টাইম।"

"তা তুমি এখানে? হঠাৎ? কোথায় উঠেছ? কবে এলে?"

"এই তো...। খুব জরুরী একটা কাজে এসেছিলাম।...তোমার খবর কি?"

বাসুদেব হাত ধরে টানল। "চলো, কোথাও বসি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না।"

"বসবে?"

"কেন?...যাবে, আমার বাড়ি যাবে?"

"এখন? এই রাত্রে?"

"রাত্তির কি হে, সবে সাতটা বেজেছে।...তুমি উঠেছ কোথায়?"

"আমি!...সে আর বলো না ভাই, অফিস থেকে একটা কাজে পাঠিয়েছিল। ...মানে, আমি একলাই নয়, অফিসের আরও স্টাফ আছে, আমরা এ দিকটায় একটা ট্যুর দিচ্ছিলাম—সেই তোমার মুঙ্গের-টুঙ্গের সব মিলিয়ে। এদিকে একটা ফ্যাক্টরি সাইট খুঁজতে হচ্ছে.. কেমিক্যাল কম্পাউন্ড তৈরী করার ইচ্ছে মালিকদের।...তোমার খবর বলো, কি করছ?"

"আমি এখন ব্যাঙ্কে, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।"

"বাঃ! ফাইন!"

বাসুদেব যতিকিশোরকে টানতে লাগল। "লেট আস সিট সাম্ হোয়ার!.. কোথায় বসবে? ভাল হোটেল হয়েছে হে শহরে, হোটেলে যেতে পার, সেটা একটু দূর পড়বে, বাজারের হোটেল তেমন ভাল নয়। চায়ের দোকানেও বসতে পার।...চলো না একটু খাওয়া-দাওয়া করবে? ওসব আছে তো?" বলে বাসুদেব চোখ কুঁচকে হাসল, হেসে যতিকিশোরের হাতে চাপ দিল বিশেষ অর্থে।

যতিকিশোর চাইছিল বাসুকে কি করে এড়ানো যায়। মিথ্যে কথা সে অজস্র বলে যেতে পারে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বানানো মিথ্যে আগাগোড়া সামলে রাখা মুশকিল। ধরা পড়ে গেলেই বিপদ। খুবই সৌভাগ্য বলতে হবে, সরসী আজ আসেনি। কাল বৃষ্টিতে ভিজে তার শরীর খারাপ হয়েছে, সর্দি, গলা ব্যথা,

জ্বর-জ্বর ভাব, মাথা ধরে আছে। সকাল থেকে অ্যাসপিরিন গোছের ওষুধ খাচ্ছে। কাশি হয়েছে। বলতে কি, যতিকিশোর ওষুধের দোকানটায় ঢুকেছিল একটা কাফ্ মিক্সচার, থ্রোট লজেন্স আর দু-একটা বড়ি জাতীয় ওষুধ কিনতে। ওষুধ কেনার সময়েই তার সঙ্গে বাসুদেবের দেখা হয়ে গেল।...সরসী যদি কাল তার উপদেশ মানত, মানে যতিকিশোরের মতন গরম জলে একটু হুইস্কি দিয়েও খেয়ে নিত তা হলে বেঁচে যেত। সরসী খেল না। যতিকিশোর সামান্য খেল কালকে। খেয়ে একেবারে চাঙ্গা হয়ে গেল। কলকাতা থেকে যতিকিশোর একটা হুইস্কি ছাড়া কিছু আনেনি। ব্র্যান্ডি সামান্য রাখলে ভাল হত।

বাসুদেব যতিকিশোরকে গলির মুখ থেকে সরিয়ে আনল। "কোথায় যাচ্ছিলে ওদিকে?"

যতিকিশোর গলিটার দিকে তাকাল, বলল, "যাচ্ছিলাম মানে—আমার কেমন মনে হল এই গলিটা বোধ হয় শর্টকাট হবে। কর্মাপ্লির্টালি ভুলে গেছি সব, গলিটা যেন কোথায় গেছে?"

"গেছে ভাল জায়গাতেই—" বাসুদেব চোখ টিপে হাসল, "সেই ফুলুরি-আলিদের পট্টিতে। আমরা যাকে ফুলুরিআলি বলতাম, মনে আছে?...বাট্ ডেজ আর ব্যাড—বুঝলে হে যতি, সেসব পুরোনো জিনিস আর পাবে না, যত্ত হাড়গিলে খড়ির গুঁড়ো মাখা মালফাল পড়ে থাকে...।"

বাসুদেব যতিকিশোরকে টানতে টানতে দু-চার পা এগিয়ে গেল।

"তা হলে কোনো চায়ের দোকানেই বসো, আমার একটু তাড়া আছে..." যতিকিশোর বলল।

"ছাড়ো, পিঁয়াজী মেরো না।...এখানেই প্রাইভেট ব্যবস্থা আছে, চলো একটু খাবে।"

"আরে না না, তুমি বলছ কি!...আমার স্টাফ রয়েছে, সুপিরিআর রয়েছে—কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

"তুমি যে কি বলছ মাইরি? এরকম তো তুমি ছিলে না? বেশ, রুটি আর ডিমের তরকারি খেতে চাও তো আমার বাড়ি যেতে হবে। চলো, আমার বউকে দেখবে। দুটো দামড়াও দেখতে পাবে।"

"আরে ব্যাস্, তুমি তা হলে এখন খুব সুখি লোক, হ্যাপি ম্যান..." যতিকিশোর হাসল।

"জরুর। আগর তুম্ বাসদেও নন্দীকো ফ্যামিলি দেখ লে গে ইয়ার, তব মালুম হোগা—উয়ো শালে বহুৎ হ্যাপি ম্যান হ্যায়!" বাসুদেব জোরে জোরে হাসতে লাগল।

যতিকিশোর দু' মুহূর্ত ভেবে তার রণকৌশল ঠিক করে ফেলল। বলল, "চলো, একটু তা হলে বসি; কিন্তু বাসু, আধ ঘণ্টার মধ্যে আমায় ছেড়ে দিতে

হবে। আমার বস্ বেটাচ্ছেলে একটা পয়লা নম্বরের হারামী। দেরী হলে শালা লাফাবে। বেটা দু' দিস্তে কাগজ নিয়ে বসে আছে...”

“কিসের কাগজ?”

“রিপোর্ট লিখছে বেটা।”

“তোমরা এখানে সাইট ঠিক করো যতি, আমার ব্যাঙ্ক তোমাদের সব রকম ফেসিলিটি দেবে।”

“এখানে হলে তো কথাই নেই...।”

বাসুদেব যতিকিশোরকে নিয়ে বাজারের পুব দিকে হাঁটতে লাগল। খানিক হেঁটে, একটা বড় গলির গা দিয়ে সে সামান্য এগিয়ে একটা দোকানের ভেতরে চলে গেল। বাইরে থেকে বোঝা যায় না এটা মদের আড্ডা, বাইরে রেডিয়ো আর গ্রামোফোনের দোকান, রেকর্ডের নানা ছবি কত কি ঝোলানো। একটা রেকর্ড বাজছিল।

ভেতরে দালান পেরিয়ে বসার ঘরের মতন একটা কুঠুরি। বেতের সোফাসেটি, সেণ্টার টেবিল, ঘরের দেওয়ালে রাজ্যের বিবসনা নারীর ছবি, প্লাস্টিকের ফুল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বাসুদেব আসবার সময়ই দোকানের কাউকে কানে কানে কিছু বলে এসেছিল।

বসে পড়ে বাসুদেব বলল, “নাও, সিগারেট খাও।” বলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই বের করে দিল।

যতিকিশোর সিগারেট নিল, বলল, “এই দোকানটা আগে ছিল না তো।”

“আগে!...আগে আর কি ছিল হে! দ্যাট ওল্ড শেরপুর ইজ ডেড। এ হল নতুন জমানার শেরপুর। তুমি ভাবতেই পারবে না বাপোত ভুঁড়িঅলাগুলো এখানে বসে মাইরি কি রেটে ব্ল্যাক মানি করছে, ওয়াগন ব্রেকিংয়ের পেট্রন হয়েছে।...এখন এখানকার কংগ্রেসেব কে চিফ জানো—সেই হীরারাম—যে শালা সোসালিস্ট, মহাসভা, জনসংঘ করে আবার কংগ্রেস হয়েছে। মনে আছে হীরারামকে, একবার আমরা ফুলবাগানের মাঠে ছিলুম, শালা রাণ্ডিবাজি করছিল!”

যতিকিশোর সিগারেট খেতে লাগল। পুরোনো শেরপুর মরে গেছে। হ্যাঁ, মরেই গেছে হয়ত, কিন্তু সকলের কাছে নয়। যে মরে যায় তার কাছে এমন করে আসা যায় না। মানুষ কবরের কাছে ফুল দিতে যায়। যতিকিশোর তো তেমন করে আসে নি।

একটা ছেলে এসে দরকারী সব কিছুই দিয়ে গেল। আধ বোতলটাক হুইস্কি, সোডার বোতল, কাচের গ্লাস, কিছু কাজু বাদাম আর কিছু ভাজা।

বাসুদেব আতিথেয়তা দেখাতে লাগল।

দু-চারটে সাধারণ কথা। এলেমেলো হাসি।

খেতে খেতে বাসুদেব বলল, "তোমার বাড়ির খবর কি? কাকাবাবু যখন চলে গেলেন তার আগে আমার সঙ্গে মাঝেসাঝে দেখা হত। কেমন আছেন?"

"ভাল।"

"মতি, হাসি কেমন আছে? হাসির বিয়ে হল কোথায়?"

"মতি দিল্লিতে। হাসির বিয়ে হয়নি। করবে না।"

"সে কি, কেন? হাসি দেখতে ভাল ছিল।"

"জানি না কেন—।"

"আচ্ছা! তা তুমি ফ্যামিলির সঙ্গে এখনও..."

"আমি আলাদা থাকি।"

"বউ কেমন?"

"চমৎকার!"

"বাচ্চাকাচ্চা?"

"তিনটে..." যতিকিশোর মজার মুখ করে বলল।

বাসুদেব টেবিল চাপড়ে হুররে দিয়ে উঠল। "ফ্যামিলি প্ল্যানিং মেনে চলেছ!" হো হো করে হাসতে লাগল বাসুদেব।

যতিকিশোরও হাসল। হাসল এবং ঠিক করল, সে যতক্ষণ বাসুর কাছে বসে থাকবে ততক্ষণ যা মুখে আসে বলে যাবে, যা খুশি চালিয়ে যাবে।

আরও কিছু কথাবার্তা। বাসুদেব আবার হুইস্কি ঢালল।

"তুমি যখন এখানে ছিলে তখন শালা আলাদা জমানা ছিল। কত এনজয় করেছি। শেরপুরের নাড়ি কাঁপিয়ে দিয়েছি। কি বলো?"

যতিকিশোর হাসল। এই সেই বাসু, যে সিদ্ধির কুলপি খেয়ে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল। তখন যার পেটে সিদ্ধি সহ্য হত না, এখন সে হুইস্কি চালায়। যতিকিশোর আড় চোখে হাতের ঘড়ি দেখল, সাড়ে সাত, আর মিনিট পনের পরে সে উঠবে। তাকে উঠতে হবে। "বাসু, আমি একটু তাড়াতাড়ি খাচ্ছি।"

"কেন?"

"বললাম যে, আমার বস্ দু' দিস্তে কাগজ নিয়ে বসে আছে।"

"কোথায় তোমার বস্?"

"ডাকবাংলোয়।"

"আরে শালা, সে তো বহুত দূর, মাইল দেড়েক।"

"হ্যাঁ—অনেকটা দূর...।"

"কাল নিশ্চয় থাকবে।...শোনো, কাল তুমি সন্ধ্যেবেলায় আমার বাড়িতে চলে আসবে। রাত্রে খাবে। আমার বউ যে কী খুশী হবে তোমায় দেখে, বাচ্চা দেখবে আমার। দুটো ষাঁড় তৈরী করেছি..." বাসুদেব হাসতে লাগল। "তোমার জন্যে একটা শুধু সাসপেন্স রাখছি।"

"কি সাসপেন্স?"

"আমার বউ।" বাসুদেব চোখ মেরে হাসল। "তুমি চেনো আমার বউকে। খুব ভালো চেনো।...আরে সেসময় ঝটকি-টটকি দিয়েছিলে।"

যতিকিশোর বাসুদেবের দিকে তাকাল। নেশা হচ্ছে বাসুর। তাড়াতাড়ি খাচ্ছে। বেশী নিয়েছে। বাসু কাকে বিয়ে করেছে? কোন্ মেয়েকে? যতিকিশোর মুখে হাসি রেখেই বলল, "কে সে?"

"বাঃ! আগে বলব কেন? কাম টুমরো অ্যান্ড সী।...আগে বললে সারপ্রাইজ কোথায়? সাসপেন্স কই? মাইরি যতি, এখনও মাঝে মাঝে তোর কথা মনে পড়ে।"

"তোমার বউ কে? কমলা? বেণু? গীতা?"

"ধ্যুত্...। কমলা-ফমলা আবার মেয়ে ছিল নাকি? মুরগির ঠ্যাং..."

"বুঝেছি, নীরু।"

"তুই শালা কিছু বুঝিসনি।...আমার বউ কদমতলার কদম ছিল..."

"নীতা?"

"হ্যায় হ্যায়...কেমন বিয়ে করেছি বল?"

নীতাকে বিয়ে করেছে বাসুদেব? সরসীর বন্ধু নীতা। যতিকিশোরদেরও বন্ধুর মতন। নিশ্চয় বাসু নীতাকে প্রেমট্রেম করে বিয়ে করেছে। যতিকিশোর হাত মেলাবার জন্যে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। "ডান ওয়েল..." যতিকিশোর হাসল।

বাসুদেব যতিকিশোরের হাত টেনে নিয়ে ঝাঁকাতে লাগল। "বউয়ের কাছে আমি গোলাম, বুঝলি যতি, একেবারে গোলাম। নীতাকে এখনও যদি তুই দেখিস, এই বয়েসেও, মাইরি বলছি—তোর ওভারড্রাফট নিতে ইচ্ছে হবে।"

যতিকিশোর হেসে উঠল। "তুই নিচ্ছিস আর কি!"

"সব সময়ে।...পারি না মাইরি। এত বয়েস হয়ে গেল, এখনও বউ পাশে না থাকলে শুতে পারি না।"

"সে তো ভাল, খুবই ভাল।"

"দুর শালা, ভাল না হাতি! এর জন্যেই তো গোলাম।..যাক্ গে, তুই কাল আসছিস?"

"যদি থাকি!"

"মানে? যদি কি রে? তুই থাকবি। আমি তোর নেংটো পোঁদের বন্ধু। শালা, মার পেট থেকে পড়ে একসঙ্গে মানুষ হলাম, আর তুই বাঞ্চোত আজ কলকাতার বাবু হয়ে আমায় ইগনোর করছিস?" বলতে বলতে বাসুদেব গেলাস ঠুকল টেবিলের ওপর, হাতের চাপড় মারল, ঝনঝন করে উঠল সব। "আমায় তুই ইগনোর করছিস? শালা যতি...তুই আমার বন্ধু হয়ে আমায় অপমান করছিস! এককালে তোর জন্যে আমি সব করেছি, তুই আমাদের

লিডার ছিলি, হীরো শালা! তোর কথায় স্কুলের ল্যাবরেটরী তছনছ করেছি. নন্দনবাবুর ইয়েতে আছোলা দিয়েছি, তোর জন্যে শালা স্ট্রাইক করেছি, একবার বলেছিস—অমনি শালা পুরো আর্মি নিয়ে স্টেশনের মুসাফিরখানা ঘিরে ফেলেছি, কি না করেছি তোর জন্যে! মনে কর ছোটলোক, সেবার ওই বাজারের কাছে মারপিটের সময় কে সোডার বোতল খেয়েছিল, সে এই মিয়া। দ্যেন্ ?... তোর কথায় ওই মায়া-বাঈজীর বাড়িতে হিজড়ে নাচার বায়না করে এসেছিলাম। করিনি...? সেই তুই আমায় আজ ইগনোর করছিস। তুই শালা আজ কলকাত্তাকা বাবু, আমি শালা শেরপুরের পুঁটি মাছ। তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে...।"

যতিকিশোর বুঝতে পারল হাওয়া কোন্ দিকে যাচ্ছে। ভালই হল...। হাত বাড়িয়ে যতিকিশোর বাসুর হাত ধরল। "না রে, তোকে ইগনোর করিনি।... যদি থেকে যেতে পারি—নিশ্চয় যাব। আসলে আমি আজ আমার বস্‌কে কনভিন্স করাবো আরও দু-একটা দিন এখানে থেকে যাবার জন্যে।...তোর বাড়িটা এখন কোথায়? সেই পুরোনো বাড়ি?"

"না; আমি নতুন পাড়ায় আছি, কদমতলার পর, নতুন পাড়া। আমার নাম বললে তোকে দেখিয়ে দেবে। ষোলো নম্বর বাড়ি। একটা বকুল গাছ আছে।"

"ঠিক আছে; চিনে নেব।...হ্যাঁ রে, এখানে একটু ইয়ে করার জায়গা নেই?"

"আছে। বাইরে। বাঁ দিক দিয়ে যা—একটা খুপরি দেখবি।"

"আমি আসছি।" যতিকিশোর উঠল, ওঠবার সময় কাশির ওষুধের ফাইলটা বাঁ হাতে টেনে নিয়ে আড়াল করল।

বাসুদেব গ্লাসটা শেষ করে ঢেঁকুর তুলল। আরও খাবে।

যতিকিশোর বাইরে এল। না, সে পেচ্ছাবখানায় যাবে না। পালাবে। যতিকিশোর দোকানের বাইরে এল। গলিটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে এসেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। উঠে পড়ল যতিকিশোর। পালাতে লাগল। বরফকলের কাছে ট্যাক্সি ছেড়ে দেবে। দিয়ে রিকশা নেবে। ট্যাক্সি গণেশকুঠি পর্যন্ত যাবে না। যতিকিশোরও চায় না ট্যাক্সি যাক।

গণেশকুঠিতে ফিরে যতিকিশোর দেখল, সরসী ঘরে তার নেয়ারের খাটের বিছানায় শুয়ে আছে। সেই পুরোনো সেজবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলছে। আলোয় সরসীর চোখমুখ দেখা যাচ্ছিল। সামান্য অস্পষ্ট। সরসী পাশ ফিরে শুয়ে ছিল। মাথার চুল এলোমেলো, ঠাণ্ডা লাগায় চোখমুখ ফোলা, সর্দির জন্যে চোখ ছলছল করছিল। সাদামাটা শাড়ি-জামা সরসীর। ছাপা শাড়ি। বালিশের কাছে রুমাল। কাশি সামলাবার।

যতিকিশোর বলল, "মাথা কেমন?"

"ধরাই আছে।"

"কড়া ট্যাবলেট এনেছি। রাত্রে শোবার সময় খেয়ে নিও। কাফ মিক্সচার আনলাম। কাল সব ঠিক হয়ে যাবে..." বলতে বলতে যতিকিশোর টেবিলের ওপর ওষুধপত্রগুলো রাখল। থ্রোট লজেন্সের একটা ট্যাবলেট ছিঁড়ে নিয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে এল। "লজেন্সটা মুখে রাখ।"

সরসী লজেন্স নিল, মুখে রাখল।

যতিকিশোর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য, তারপর বিছানায় সরসীর পাশে বসল। "তোমার শরীর এত পলকা জানতাম না।"

"বাজে বকো না। অত ভিজলে মানুষ নিউমোনিয়া হয়ে মরে যায়।... দেখো না, এই জ্বর থেকে আমারও নিউমোনিয়া হবে, মরব। আমায় এখানে কোথাও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে তুমি ড্যাং ড্যাং করতে করতে কলকাতায় ফিরে যেও।"

যতিকিশোর হেসে ফেলল। "আমার ওষুধ তো খেলে না; খেলে দেখতে...।"

সরসী যতিকিশোরের মুখ থেকে হুইস্কির গন্ধ পেল। পেয়ে অবাক হল। যতি এখানে বাড়িতে বসে রাত্রের দিকে অল্পস্বল্প খেয়েছে। দু'এক দিন। বাইরে গিয়ে নয়। লক্ষ্য করল সরসী, যতির যে সামান্য নেশা হয়েছে বোঝা যায়, চোখ দেখে। কেমন যেন অবসাদ জড়ানো। সরসী বলল, "এখনও কি ওষুধ খেয়ে এলে?"

মাথা নুইয়ে নাড়ল যতিকিশোর। "বাসুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেই বাসু, আমার বন্ধু ছিল। সিদ্ধির কুলপি খেয়ে যার কলেরার মতন হয়েছিল।"

নামেই সরসী চিনল। চেনার মতন ছেলে। কী পাজিই ছিল! যতির ডান হাত।

যতিকিশোর বলল, "ওষুধের দোকানে দেখা হয়ে গেল। চিনেও না চেনার ভান করে পালিয়ে আসছিলাম, বেটা রাস্তায় নেমে এসে পাকড়াও করলে। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। হাজার রকম প্রশ্ন। আমি তো ভেবেছিলাম ওকে এড়িয়ে পালাতে পারব না। কোনো রকমে পালিয়ে এসেছি...।" যতিকিশোর একটু হাসল।

সরসী বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, "তা হলে ধরা পড়ে গেছ বলো! আমি না তোমায় বলেইছিলাম, যতই লোকের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করো, কারুর না কারুর চোখে ঠিক ধরা পড়বে।"

যতিকিশোর কথাটা শুনল, গা করল না, বলল, "বাসু কাকে বিয়ে করেছে জান? তোমার বন্ধু অনিতা—মানে নীতাকে।"

"নীতা?" সরসী কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে থাকল। "ও মা, নীতাকে

বিয়ে করেছে! নীতা আমাদের তিন-চারটে বাড়ি পরে থাকত। যা ঝগড়ুটে ছিল।...ইস্ আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।" সরসী যেন খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠবে এই রকম চঞ্চল হয়ে পড়ল। "কেমন আছে সব? কি রকম দেখতে হয়েছে নীতাকে? সত্যি কি আশ্চর্য!...ওর বাচ্চাকাচ্চা হয়নি?"

"দুটো বাচ্চা; ছেলে।"

"বাঃ, বেশ হয়েছে।...আর কারও খবর পেলে? আরতির কথা জিজ্ঞেস করলে? নটুকাকি, মালতী, বসন্তকাকা, আশা কাকিমা...?"

"না।"

"না কি?" কারও কথা জিজ্ঞেস করলে না?"

মাথা নাড়ল যতিকিশোর। "আমি কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। নিজেদের কথাও কিছু বলিনি। কোনো রকমে আজেবাজে মিথ্যে কথা বলে ওর হাত থেকে পালিয়ে এসেছি।"

সরসী যতিকিশোরকে লক্ষ্য করল। তারপর যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, "পুরোনো লোকজনের কথা জিজ্ঞেস করতেও তোমার ইচ্ছে হল না?"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল যতিকিশোর, বলল, "কি হবে?"

"তা হলে এখানে এলে কেন?"

কথা বলল না যতিকিশোর। সরসী দু' মুহূর্ত যতিকিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। বুঝল, এ প্রশ্ন অকারণ। অনেকবার এই একই প্রশ্ন করেছে সরসী; যতিকিশোর হেঁয়ালির মতন করে বলে, 'নিজেকে দেখতে।' এ কেমন ধরনের দেখা সরসী বোঝে না।

বিছানার পায়ের দিক থেকে সরসী নেমে গেল। চটি পায়ে দিল। নীচে যাবে একটু। টেবিলের ওপর থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেল সরসী।

যতিকিশোর বিছানায় বসে থাকল। তাকে খুশী মনে হচ্ছিল না। যেন অবসাদ এসেছে। ক্লান্ত, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। কিছুই লক্ষ করছিল না, সরসীর মাথার কাছে একটা মথ্ এসে বসল, উড়ে গেল। যতিকিশোরের যেন কপালে এবং চোখে যন্ত্রণা হচ্ছিল, বাঁ হাতটা মুখের ওপর রেখে চোখ ঢেকে বসে থাকল আরও একটু, তারপর উঠল।

জামাটা ছেড়ে ফেলল যতিকিশোর। প্যাণ্ট ছেড়ে পাজামা পরল। জানলার বাইরে জ্যোৎস্না। কাল মেঘে-বৃষ্টিতে সব কালো হয়ে ছিল, আজ জ্যোৎস্না। খুব স্পষ্ট। কাছাকাছি যেখানে যা আছে নিখুঁতভাবে দেখা যায়। সরসী ফিরে আসছে। কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছে পায়ের। এতোক্ষণ নীচে কি করছিল কে জানে! হয়ত ভকতের সঙ্গে কথা বলছিল। খাবারদাবার গুছিয়ে ওপরে তুলে দিতে বলছিল। অনর্থক তাকে বসিয়ে রাখে না সরসী। ভকত

ওপরে খাবার তুলে দিয়ে নিজে খাওয়াদাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ে।

সরসী ঘরে এল। যতিকিশোর তখনও জানলার কাছে দাঁড়িয়ে।

"নীচে যাবে?" সরসী শুধলো।

"যাই।"

হাতে মুখে জল দিয়েও যতিকিশোরের অবসাদ গেল না। মাঝে মাঝে অসম্ভব বিরক্তি লাগছে। কখনো কখনো কি যে এক দুঃখ এসে মন ভেঙে দিচ্ছে! বড় চঞ্চল, দিশেহারা, ব্যাকুল লাগছিল। এই রকমই লাগে তার। হঠাৎ কোথায় একটু গুমোট লাগে, তারপর তার সমস্ত চেতনা অস্থির, বিষণ্ণ হয়ে যায়; মনে হয় সমস্ত বাতাস রুদ্ধ হয়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হয়। যতিকিশোরের তখন সেই কুয়ার কথা মনে হয়, যা পুরোপুরি শুকনো হয়ে অন্ধকার আর গভীর তলদেশের পাথর, গুল্ম ও কোনো সরীসৃপ নিয়ে পড়ে আছে দীর্ঘ দিন ধরে।

কেন এমন হয়, যতিকিশোর জানে।

ওপরে ঘরে এসে যতিকিশোর দেখল, সরসী বিছানায় বসে আছে। ভকত লম্বা কাঠের টেবিলটার ওপর টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে খাবারদাবার রেখেছে, কাচের প্লেট গোটা দুই, কলাই করা থালা, কাচের গ্লাস, কুঁজোতে জল।

সরসী জিজ্ঞেস করল, "খাবে এখন?"

"এখনই?"

"আমার তাড়া নেই। খেতেও ইচ্ছে করছে না।"

"পরে খাব। ন'টাও বাজেনি বোধ হয়।"

সরসী বার কয়েক কাশল। ভারী গলার কাশি, সর্দি জড়ানো। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল।

যতিকিশোর যেন বুঝতে পারল না কি করবে। উৎক্ষিপ্ত, বিরক্ত লাগছিল। কিছু ভাবল। তারপর স্যুটকেস টেনে নিয়ে হুইস্কির বোতলটা বের করে নিল। বেশি নেই। যা আছে—এই মুহূর্তের পক্ষে তা যথেষ্ট।

কাচের গ্লাস নিয়ে যতিকিশোর হুইস্কি ঢালছিল, সরসী দেখল। বলল, "আবার?"

"সামান্য।"

"এই তো খেয়ে এলে।"

"আমি বেশী খাইনি।...একটু ধরিয়ে দিলে এসব বড় বিশ্রী, নেশা পেয়ে যায়..."

"কি জানি! বেশী খেও না।"

যতিকিশোর জল মিশিয়ে নিল। নিয়ে নিজের বিছানার কাছে এসে

বসল। সামান্য খেল। সরসীকে দেখল। বালিশে মাথা রেখে সোজা হয়ে শুয়ে আছে। পায়ের পাতা নাড়ছে। বাসু নীতাকে বিয়ে করেছে। একই পাড়ার ছেলেমেয়ে। প্রেম ভালবাসা করেই করেছে বোধ হয়। যতি-কিশোরও সরসীকে বিয়ে করতে পারত। যতিকিশোরও বরাবর শেরপুরে থেকে যেতে পারত বাসুর মতন। ব্যাঙ্কে চাকরি করত, না হয় রেলে, কিংবা বাবার ব্যবসা ধরে নিত। যতিকিশোর যদি শেরপুরে থেকে বাবার ব্যবসা ধরত—তা হলে আর বাবার পক্ষে, তাদের পরিবারের পক্ষে কলকাতা যাবার দরকার হত না। বড় ছেলে কাছে থাকলে এবং হাল ধরলে কেনই বা বাবা পৈতৃক ভিটে ছেড়ে এতোকালের জায়গা ছেড়ে চলে যাবে! মতি এখানেই থাকত, হাসি থাকত। এখানে থাকলে হাসির বিয়েও বোধ হয় হয়ে যেত চেনাজানা কোনো ছেলের সঙ্গে।

সবই হত; কিন্তু কিছু হয়নি। যেভাবে গড়া যেত, বা যেতে পারত, সেভাবে গড়া হয়ে ওঠেনি। যতিকিশোর ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে, দুর্গা-মূর্তি বাঁধার সময় কুমোর যেভাবে প্রথম থেকেই খড় বেঁধে নেয়, কালী বা সরস্বতীর মূর্তির সময় বাঁধে না। দুটো আলাদা। যতিকিশোর প্রথম থেকেই খড় বাঁধায় ভুল করেছে।

সরসী পাশ ফিরল। পাশ ফেরার সময় তার পায়ের কাপড় সরে গিয়েছিল; ঠিক করে নিল। কিছু বলতে যাচ্ছিল যতিকিশোরকে, মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, যতিকিশোর যেন কিছুই দেখছিল না, বিছানা ছেড়ে উঠে দরজার দিকে চলে গেল ধীরে ধীরে।

বাইরে জ্যোৎস্না। মকাই ক্ষেতের মাথায় জ্যোৎস্না সাদা রেশমী চাদরের মতন ছড়িয়ে ছিল। মাঠে ঘাসে চাঁদের কিরণ নিঃঝুম হয়ে পড়ে আছে। আদিগন্ত ঝিমঝিম করছে। হালকা, পাতলা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে যাচ্ছে পুবের দিকে।

যতিকিশোর বারান্দার রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকল। হুইস্কি শেষ করছিল ধীরে ধীরে। সামনে তাকিয়ে ছিল, জ্যোৎস্না দেখছে অথচ এই জ্যোৎস্নায় তার মন পড়ে নেই, এমন কি তার চোখেও জ্যোৎস্না ধরছে না।

বাসু ঠিকই বলেছে। যতিকিশোর মাথা হেলিয়ে স্বীকার করল, বাসু ঠিকই বলেছে। একসময় যতিকিশোর এই শহরের হীরো হয়ে উঠেছিল, লীডার হয়ে পড়েছিল; বাসু, কেষ্ট, দুবে, বংশী আরও কত কে তার একান্ত অনুগত ছিল, যতিকিশোর হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে না। বাসু সত্যিই তার জন্যে সোডার বোতল খেয়েছিল, ছিটকে আসা কাচে তার পা কেটে গিয়েছিল, একটা টুকরো কানের লতি ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে ঘাড়ে লেগেছিল। দুবেও যতি-কিশোরের জন্যে একবার জোর জখম হয়েছিল, আরও বড় জখম, বাঁ হাতের কনুই ছেড়ে গিয়েছিল বেচারীর। বন্ধুরা তাকে তামাশা করে 'গুরুজী' বলত,

বলত 'হামারা লীডার।'...অবশ্য এসব বড় কথা নয়, বন্ধুরা তাকে গুরুজী বলত, লীডার বলত, তাতে মজা থাকতে পারে হয়ত, আসল ব্যাপারটা কিন্তু নেই। আসল ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম, সেই আসল থেকে এইগুলো এসেছিল এই মাত্র।

যতিকিশোর কেমন অস্থির হয়ে বড় করে একটা চুমুক দিল। তারপর দ্বিতীয় নিঃশ্বাস প্রায় না ফেলেই আরেক চমুক। গলার টাগরার কাছ থেকে জ্বলা লাগা গরম ভাবটা বুকে বাতাসের পুঁটলির মতন নেমে গেল। জল কম দিয়েছে যতিকিশোর। জিবের ডগা খসখস করে উঠছে।

বাসু বলছিল...কি বলছিল?...বাসু বলছিল, তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে। কে বলেছে যতিকিশোর সাধু হয়েছে? না, সে সাধু হয় নি, সাধু হবার বাসনা থাকলে এমন হয় না। যতিকিশোর চোর। চোর হয়েই সে এসেছে। চোর না হলে শেরপুরে আসত না।

গ্লাস শেষ করে যতিকিশোর ঈষৎ ছলছলে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কিছু বোঝা গেল না, বারান্দার কাঠ ঘেঁষে বাদুড়ের মতন কি একটা উড়ে গেল মুখের পাশ দিয়ে, মাথা সরিয়ে নিল যতিকিশোর। পুবের দিকের মেঘ ছিঁড়ে একটা খণ্ড চাঁদের গায়ে এসে গেছে কখন, আলো ঢাকা পড়েছিল।

যতিকিশোর ঘরে এল। সরসী বিছানায় নেই। তার মাথার দিকের জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্না দেখছে হয়ত। লাল তেলের বাতি জ্বলছিল।

যতিকিশোর গ্লাস রেখে দিল। দিয়ে সরসীর পিঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সরসী নড়ল না। যতিকিশোর দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে। সরসীর চুলের আলগা বিনুনি আঁচলে ঢাকা পড়ে আছে, গায়ে আঁচল জড়ানো। বাঁ দিকে ঘাড় সামান্য হেলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সরসী। তার এলোমেলো চুলের গুচ্ছ মাথার আশেপাশে জালের মতন ছড়ানো, কানের সঙ্গে চুল জড়িয়ে আছে। কেমন উষ্ণ, জ্বরের উষ্ণ গন্ধ যেন যতিকিশোরের নাকে লাগল। যতিকিশোর হাত বাড়িয়ে সরসীর কাঁধে রাখল। সরসী যেমন দাঁড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়ে থাকল।

যতিকিশোর বলল, "শশি, বাসু একটা কথা বলছিল।"

"কি কথা?" মৃদু করে সরসী বলল।

"বলছিল, আমি নাকি সাধু হয়ে গেছি।"

"নাকি?"

"তোমার কি মনে হচ্ছে আমি সাধু হয়ে গিয়েছি?" যতিকিশোর যেন কৌতুক করে হাসল।

সরসী কোন জবাব দিল না, অনুভব করল—যতি তার পিঠের সঙ্গে আরও ঘন, ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে। সরসীর নামানো হাত যতিকিশোর ধরে

নিল আস্তে করে।

"যে সাধু হয়ে যায় তার আর শেরপুরে আসার দরকার কি?" যতিকিশোর একই রকম কৌতুকের গলায় বলল।

সরসী যতিকিশোরের বুকের চাপ কাঁধের কাছে, পিঠে অনুভব করছিল। দ্রুত স্পন্দন।

"তুমি সত্যি সত্যি কেন এসেছ?" সরসী অস্পষ্ট গলায় শুধলো।

"কেন! তুমি কি কিছু বুঝতে পারলে না?"

"পেরেছি—" সরসী দ্বিধার গলায় বলল, "কিছু পেরেছি। তুমি এমন করে এখানে ঘুরে বেড়ালে, মনে হল, এখানে তোমার কত কি ছিল, খ‍ুঁজে খ‍ুঁজে দেখছ। সত্যি, তুমি কত ছেলেমানুষী করলে, কত সময়ে কি খুশীই যে হলে, আবার মাঝে মাঝে তোমার কত আফসোস।..." সরসী থামল, যতির হাত নিজের বুকের কাছে টেনে নিল ধীরে ধীরে। বলল, "আমি তাই ভাবি, ভাবি, এই শেরপুরকে তুমি কী ভালই বেসেছিলে। কই, আমার তো অমন হল না?"

যতিকিশোর কথা বলল না প্রথমে, পরে বলল, "তুমি তো শুধু ভালই বেসেছিলে শশি, এখানে কোন পাপ রেখে যাও নি। আমি যে অনেক পাপ রেখে গিয়েছিলাম।"

সরসী ঘাড় ফেরাল বেঁকা করে।

যতিকিশোর বলল, "তা বলে তুমি ভেব না, আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। প্রায়শ্চিত্তে আমি বিশ্বাস করি না। শুধু স্বীকার করতে এসেছি, হ্যাঁ, আমি হেরে গিয়েছি।"

সরসী যতিকিশোরের চোখে মাছির মতন দুটি বিন্দু দেখছিল।

১০

আমরা কোনো না কোনো দিন এইভাবেই ফিরে আসি, শশি; পাপী যেমন করে তার পাপের জায়গায় ফিরে আসে। হয়ত সব সময়, সকলের বেলায় এমন হয় না, তবু কারও কারও বেলায় এই রকমই হয়। শেরপুরে আমরা প্রায় তিন পুরুষ বসবাস করেছি। ঠাকুরদা জীবনের শেষ আটাশ কি তিরিশ বছর, বাবা তো তারও বেশী, একেবারে শেষ বয়সে শেরপুর ছাড়লেন। আর আমি আমাদের কদমতলার বাড়িতে মা'র নাড়ি থেকে নিজেরটা আলাদা করে খুঁজে পেয়েছি। তিথি নক্ষত্র নিয়ে আমার কোনো কালেই মাথাব্যথা ছিল না, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, মা-বাবার ছিল। শুনেছি, আমি ভাল সময়ে জন্মেছিলাম, রাজ-লক্ষণ নিয়ে। আজকাল আর রাজায় সুখ নেই, শেরপুরের অতটুকু রাজা, সে বেচারীই টিকতে পারল না শেষ পর্যন্ত, কাজেই রাজা হয়ে কি লাভ! আমি জন্মাবার পর বাড়িতে ছোটখাট শুভ ব্যাপার হচ্ছিল, যেমন ঠাকুরদার ব্যবসাপত্রে কিছু বাড়তি আয় হল, একটা পুরোনো মামলায় ঠাকুরদা জিতে গেলেন— এই সব আর কি! আবার আমার জন্মের বছর তিনেকের মাথায় ঠাকুরদা মারাও গেলেন। বাড়িতে আমি প্রথম শিশু, ঠাকুরদার 'নাতি-শালা', ঠাকুমার 'গোপাল সোনা', আদর-যত্নে ঘটাটা বেশীই ছিল। যখন জ্ঞানগম্যি হয়েছে, খানিকটা তার দেখেছি। আমার যত্নের তিলমাত্র ঘাটতি হলে মাকে ঠাকুমার গালমন্দ শুনতে হত। বাবা একবার আমায় তাঁর চশমা ভাঙার জন্যে কান মলে বিরাট ধমক দিয়েছিলেন, ঠাকুরমা সেই দিনই বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে কাশীবাসী হয় আর কি! বাবা দমে গিয়েছিলেন।...এসব মজার কথা, হাসির কথা; অনেক ছেলেপুলের ভাগ্যেই হয়ত এমন আদর অতি শৈশবে জুটে যায়। সেটা যে বরাবর টিকে থাকে তাও নয়। আমার বেলায় দীর্ঘদিন ছিল। মতি হবার পরও ঠাকুরমার বা মা'র আদর বিন্দুমাত্র কমেনি। বাবার স্নেহের অভাব হয় নি। আমাদের পরিবার শেরপুরের বাঙালী মহলে যথেষ্ট খাতির পেত। বেহারীরাও ঠাকুরদাকে সম্ভ্রম করত প্রচুর, বলত : 'দাদাজী'। বাবা ঠাকুরদার মতন শহরের মাথার মণি হতে পারেন নি ঠিকই, তবু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা

সম্মানের অভাব দেখা যেত না। সোজা কথাটা এই, শেরপুরে আমরা শুধু পুরোনো ছিলাম না, সম্মানিত পরিবার ছিলাম, আমাদের আভিজাত্য ছিল, লোকের চোখে আমাদের পরিবারের মূল্য ছিল।

এমন একটা পরিবারে জন্মে, সেই আবহাওয়ায় বেড়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার কি যে হল, আমি অন্য দিকে ছিটকে গেলাম। কেন গেলাম? আমি অনেক ভেবেছি, শশি; স্পষ্ট করে তার কোনো জবাব পাই নি। এক এক সময়ে আমার একটা তুলনা মনে পড়ে। কেউ কেউ বলে, এই পৃথিবী যখন জন্মায় তখন সে সূর্য থেকে ছিটকে এসে পড়েছিল। কোন্ অদৃশ্য নক্ষত্র যেতে যেতে কত কোটি কোটি মাইল দূর থেকে আকর্ষণ করল, আর বাষ্পময় সূর্যের খানিকটা সেই আকর্ষণে ছিটকে এল, ছিটকে এসে শূন্যে থমকে গেল, না পারল এগুতে, না পারল পিছুতে—শূন্যে সে আপন বেগে ঘুরতে লাগল, ঘুরতে ঘুরতে ঠাণ্ডা হল, ঝড় বৃষ্টি তুষারপাতের যুগ শেষ হয়ে শেষে দেখা দিল এই মাটি আর জলের পৃথিবী।—যাক্ গে পৃথিবীর কথা, আমার কথা বলি। আমি আমাদের পরিবার থেকে ছিটকে এলাম। কেন এলাম? এমন কিছু কি ঘটেছিল আমাদের পরিবারের ভেতরে ভেতরে যার ফলে আমার ছিটকে আসা সম্ভব হয়েছিল? কিংবা বাইরের কোন আকর্ষণ—ওই নক্ষত্রের মতন ছুটে যেতে যেতে আমায় ডেকেছিল, টেনেছিল? হয়ত দুটোর মধ্যেই কিছু সত্য আছে। দ্বিতীয়টায় বেশী। আমাদের পরিবারের মধ্যে যে ধরনের বাঁধন ছিল, শাসন ছিল, মান্য অমান্যের নীতি ছিল, সংস্কার ছিল, ভাল-মন্দের বোধ ছিল—হয়ত সেই প্রাচীনতার সবটা আমার পছন্দসই ছিল না। হয়ত অত্যধিক আদরে আমি বেয়াড়া হয়ে গিয়েছিলাম। কিংবা বাবা যেভাবে আমাদের চালাতে চাইতেন, নিরীহ শান্ত ভীরুর মতন—খরগোশের মতন—তাতে আমার অহমিকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তুমি জান শশি, আমি ছেলেবেলায় কত লক্ষ্মী ছেলে ছিলাম, শান্ত শিষ্ট অনুগত, সব ছেলেই যতটুকু ছেলে-মানুষি করে, দুষ্টুমি করে তার বেশী আমি কিছুই করি নি। আমি তোমার সঙ্গে তেঁতুলবিচি নিয়ে বাঘবন্দী খেলেছি, লুডো খেলেছি, তোমার পুতুলের বিয়েতে বসে বসে সাবানের বাক্সে রঙীন কাপড়ের টুকরো সাজিয়েছি, আরও কত কি!...আমার বন্ধুরা আমাকে খেপাত, বলত, 'তুই একেবারে মেয়ে'। আসলে আমি শান্ত গোবেচারা ধরনের ছিলাম। তারপর একদিন সেই ঘটনাটা ঘটে গেল স্কুলে। তখন হাওয়া গরম, শেরপুরেও চাপা উত্তেজনা চলছে, আমি আমার বন্ধু রুবেন ডলবির সঙ্গে মারপিট করে এলাম, ছোরা মারামারি হতে হতে বেঁচে গেল, কিন্তু আমার হাত কেটে রক্ত ঝরল, রুবেনের গলায় আমার হাতের রক্ত লেগে তার জামা লাল হয়ে গেল। সেদিন আমার খুব জয়জয়কার হয়েছিল স্কুলে, বন্ধুরা বলেছিল, আমার সাহসের শেষ নেই।

অথচ বাবা, সমস্ত ব্যাপারটাকে উলটোভাবে নিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, আমি ভদ্র পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি, ন্যায়, সমস্ত ভুলে একটা গুন্ডা-বদমাশ গোছের ছেলে হয়ে গিয়েছি। ওই বয়েসে, এত কথা বোঝার মতন মাথা হয় না। এইটুকু শুধু বুঝেছিলাম, বাবা কাজটা শুধু অপছন্দ করেন নি, বিরক্ত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। আবার ওই মারপিটের জন্যে স্কুলের আর পাড়ার বন্ধুদের কাছে আমি রাতারাতি মরদ হয়ে গেলাম। যারা ভাবত, আমি মেয়েমানুষ, তারা আমায় হঠাৎ পুরুষমানুষ করে দেখতে লাগল। তাও ছুরিটা ধরতে পারিনি, ধরতে গিয়ে নিজের হাতই কেটেছিলাম। রক্তের কি মহিমা! না, ঠিক রক্তের নয়, হিংস্রতার, ঘৃণার, উন্মত্ততার কি মহিমা!...কিন্তু শশি, তোমার কি মনে হয় নি, আমাদের শেরপুরেও এই রকম একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছিল? বৃটিশরাজ খতম করার জন্যে যেমন আকুলিবিকুলি, সেই রকম বৃটিশরাজকে মদত দেবার জন্যে শেষ দিকে লাল ঝান্ডাদের কেমন অফিস বসে গেল নীচু বাজারের সেই পার্বতীবাবুর কাঠগোলার পাশে, মনে আছে তোমার? তুমি অত বুঝবে না, একে মেয়ে, তার ওপর কতই বা বয়েস তোমার তখন। আমিও বুঝতাম না। কিন্তু আমি ছেলে, আমার কত রকম জিনিস দেখতে হত, শুনতে হত। স্কুলের ঘটনার পর থেকে আমার একটা ইজ্জৎ হয়ে গেল। স্কুলের বড় ছেলেরা আমার পিঠ চাপড়ে দিত, বন্ধুরা খাতির করত, এমন কি, আমাদের মথুরকাকা আমায় বলেছিলেন—'বেশ করেছ, ওই বেটা দোআঁশলাগুলো সাহেবদের পেয়ারের, বেটারা চাকরি পেলেই কোয়ার্টার পায়, প্রমোসান পায়, হারামজাদার দল।' মথুরকাকা রেলে চাকরি করতেন, পোষ্য অনেক, বেচারীর মনে অনেক ক্ষোভ আর ঈর্ষা ছিল। আমি বরাবরই ভেবে এসেছি, যা করেছি সেটা ন্যায়, সেটা উচিত কাজ। বাবা যাই ভাবুন আর বলুন, আমার কাজ আমি ঠিকই করেছি।...ইংরেজদের সঙ্গে যদি আমাদের ঝগড়া, তবে যাবা সাহেবদের পা চেটে মজায় আছে, তারা কেন বন্ধু হবে? আমি বুঝি নি, রুবেন, ডপনি বা লেসলির সঙ্গে সাহেবদের কোনো সম্পর্ক নেই।...শুরু সেখানেই। তারপর এল গোপীকিষণের সঙ্গে লড়াই। গোপীকিষণকে তোমার মনে আছে? নেই? মনে না থাকবারই কথা। গোপী ছিল হাবাগোছের, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ছিল, সে রেলের গ্রেন্-শপে চাল ডাল তেল ওজন করত। গোপী লাল ঝাণ্ডার—আমরা যাকে ঝাণ্ডা পার্টি বলতাম —তার অফিসে রাত্রিবেলা বসত, হুকুম খাটত। একদিন গোপীর সঙ্গে আমাদের পল্টুর বাবার খুব ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল গ্রেন্-শপে। গোপী ওজনে মারত, ওজন মেরে দু' পয়সা কামাত। পল্টুর বাবা বাড়িতে এসে বুঝি বলেছিল ব্যাপারটা। আর এমনই কপাল, পরের দিনই গোপীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল মসজিদটার কাছে। পল্টু বাড়ি থেকে শুনে এসেছে ব্যাপারটা,

গোপীকে দেখেই তার মাথা গরম হয়ে গেল। সে একটা গালাগাল দিল গোপীকে, রাস্তায় যেমন লোকে দেয়, রাগের মাথাতেই। গোপীর কানে গিয়েছিল গালাগালটা। সে তেড়ে এল। গোপীর বয়েস বেশী, তাগড়া, আর আমরা তো ছেলেমানুষ। পল্টু ভয় পেয়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়াল। গোপী মুখ খারাপ করে যাচ্ছেতাই বলছিল, পল্টুকে মারে আর কি। আমরা মাঠ থেকে হকি খেলে ফিরছিলাম, হাতে ছিল হকি স্টিক। গোপী ভাবতেই পারে নি তাকে মারবার সাহস আমাদের হবে। কি যে হল আমার, চক্ষের পলকে গোপীর মুখের ওপর স্টিক ঝাড়লাম। ওই তাগড়া লোকটা চিৎকার করে উঠে দু' হাতে মুখ ঢাকল। দরদর করে রক্ত পড়ছে তার নাক মুখ দিয়ে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। আমরা মাত্র তিন-চার জন, সকলের হাতেই হকি স্টিক। গোপী পারল না। ওই জোয়ান শরীর নিয়েও পারল না। হেরে গেল। আমরা জিতে গেলাম—আমি।...এই জিতটাকে তুমি মারপিটের জিত বলো না। আসলে জিতটা হল ন্যায়ের। গোপী গ্রেন্-শপে মাল ওজন করে কম দেয়, আর বাড়তি মাল 'বিলাকে' বেচে পয়সা কামায়, তাকে মারার অধিকার আমার আছে। হ্যাঁ...আমি তাই ভেবেছিলুম। পল্টুর বাবা গ্রেন্-শপের ক্যাশবাবু। তখন বুঝি নি, ক্যাশবাবুর সঙ্গে গোপীর কামাই নিয়ে বনিবনা হচ্ছিল না বলেই ঝগড়া। পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু তাতে কি! গোপীকে মারার পর থানা-পুলিশের ঝঞ্ঝাট হতে পারত, পল্টুর বাবা সেই ঝঞ্ঝাট থেকে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।...শশি, এমনি করেই আমি বড় হয়ে উঠেছিলাম, রুক্ষ হিংস্র বেপরোয়া হয়ে। তোমায় বলছিলাম না, শেরপুরের বাতাসে তখন হাওয়া পালটেছে। গরম হাওয়া। হ্যাঁ, মানুষজন তখন ওই রকমই হয়ে যাচ্ছে। রুক্ষ, মাথা গরম, অসহিষ্ণু, চোর, বদমাস। শেরপুরে তখন দাঙ্গা লেগে গেল। প্রথম দিনেই চার পাঁচটা খুন জখম। বরফ-কলের কাছে তেল ডিপোর সামনে প্রথম খুন; আমাদের পাড়ার একেবারে গায়ে। যে খুন হয়েছিল তাকে তুমিও চেনো না, আমিও চিনি না। আমাদের ছোট লাইনের রেলে কখনো দু'-চারটে ছাগল কাটা পড়ত, গরু-বাছুরও কটা পড়েছে দু' একটা। একবার একটা লোক কাটা পড়ে, পুলটার নীচে। সারা শহরে সেটা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল; সবার মুখে মুখে একই কথা ; 'ইস্, একটা লোক কাটা পড়েছে রেলে।' তখন শহরের বুলি ওই রকমই ছিল। দাঙ্গা লাগার পর বুলি পালটে গেল, তখন আর লোক নয়, মানুষ নয়, হয় সে মুসলমান, না হয় হিন্দু। মানে আমরা ঠিক করে নিলাম, এক দলের আরেক দলকে খুন জখম করার অধিকার আছে, করলে যে যার নিজের দলকে গৌরবান্বিত করবে। দাঙ্গা লাগার পর আমাদের মহল্লায় কত রকম তোড়জোড়। তোমার যমুনাপ্রসাদকে মনে আছে? দাঙ্গা লাগার সঙ্গে সঙ্গে যে সাইকেলে চেপে তার দলবল নিয়ে আমাদের বাড়ি

বাড়ি ঘুরে বেড়াত, হাতে ছাপা কাগজ গুঁজে দিত। সেই যমুনাপ্রসাদ আমায় বলল, 'আরে ইয়ার, কুছ ভি কাম তো দেখাও। বেঙ্গল মে হাজারোঁ হাজারোঁ মেরা আদমি খতাম হো রহা হ্যায়, আখ্বার দেখো...!' যমুনাপ্রসাদ আমাকে কিছু দেখাতে বলল, শৌর্য, বীর্য, আমার বাপঠাকুরদার ধর্মের প্রতি আনুগত্য। আমাদের পাড়ার রণজিৎদা, বাবরি-করা চুল, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গজল গাইত, পান খেত আর তোমাদের বাড়ির সামনে সন্ধ্যের দিকে হাজির হয়ে মায়ামাসিকে পিপারমেণ্ট দেওয়া পান খাওয়াত—সেই রণজিৎদাকে দেখলাম খাঁড়া হাতে মাথায় পাগড়ি বেঁধে কেরোসিন আর পেটরলের টিন নিয়ে সাঙ্গপাঙ্গ সমেত ধর্মযুদ্ধ করতে বেরুলো একদিন। এমন একটা উত্তেজক, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমরা কিছু করব না—এটা কেমন করে হয়? যমুনাপ্রসাদ আমায় কিছু দেখাতে বলেছিল। আমরাও একদিন—নীচুবাজারের পশ্চিমে—যেখানে টাঙাঅলাদের বস্তি, তার গায়ে ইমামের দোকানটা পুড়িয়ে দিয়ে এলাম। ইমাম ছিল না। দোকান বন্ধ করে সে আগেই মসজিদের দিকে মুসলমান মহল্লায় পালিয়ে গিয়েছিল। বেচারী ইমাম, আমার বাপের বয়সী, নিতান্তই একটা দরজি, তার দোকানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আমরা কতটা ধর্মযুদ্ধ করেছিলাম জানি না। কথাটা জানাজানি হয়ে যাবার পর—আমার বাবা আমায় পায়ের জুতো খুলে মেরেছিলেন। বাবাকে সেদিন আমার আরও ভীতু, স্বার্থপর, বিধর্মী মনে হয়েছিল। বাবাকে কিছু বলতে পারি নি, কিন্তু বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—দোষ কি আমার? তুলোপট্টিতে কেন হিন্দু খুন হয়েছে, মসজিদের সামনে কারা রেলের খালাসী রাধাশ্যামকে ছুরি মেরেছে? কারা রেল কলোনীর সামনে বাছুর কেটে ফেলে গেছে?...আমাদের শহরের দাঙ্গা অবশ্য বেশীদিন গড়ায় নি। দিন পাঁচ-সাত পরে অবস্থা ভাল হল। কিছু মিলিটারী ঢুকে পড়ায় সব ঠাণ্ডা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অবিশ্বাস, সন্দেহ, রাগ, ঘৃণা। লালঝাণ্ডাদের একটা দল—অবস্থা ঠাণ্ডা হয়েছে দেখে—হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই করে বাজারে ঘুরে বেড়াল দিন দুই। ওর মধ্যে গোপী ছিল, শশাঙ্কদা ছিল। শশাঙ্কদাকে তোমার মনে আছে শশি? আমাদের পাড়ার পেছন দিকে থাকত টুলুর দাদা? রোগাটে ক্ষয়া চেহারা, ভীষণ টেরা চোখ বলে গগল্স্ পড়ে থাকত। কিছুদিন রেলের প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করে পরে কোলিয়ারীতে চাকরি করতে গিয়েছিল। সেখানে ঝগড়াঝাটি করে ফিরে আসে। শশাঙ্কদা শেষে বাজারে একটা চায়ের দোকান দেয়। সেখানে বড় ছেলেদের আড্ডা বসত, শেরপুর ইউনাইটেড ক্লাবের ফুটবলের জার্সি শুকোতো, চলতি সিনেমার পোস্টার থাকত। শশাঙ্কদা কিন্তু লোকটা খারাপ ছিল না। সেই শশাঙ্কদা আমায় যে নজরে রাখছিল আমি বুঝতে পারি নি। বুঝলাম পরে, যখন একদিন দোকানে বসিয়ে চা

খাওয়াতে খাওয়াতে শশাঙ্কদা বলল, 'কিরে যতি, পড়াশোনা কেমন করছিস?' আমার পড়াশোনা আমার মতন চলছিল, না খারাপ, না খুব একটা ভাল। ভগবান আমায় দুটো জিনিস বেশী করেই দিয়েছিলেন, স্মৃতিশক্তি আর সহজে একটা জিনিস বুঝে নেবার ক্ষমতা। শশি, তুমি জানো, লেখাপড়ায় আমি পয়লা নম্বর ছিলাম না—হবার চেষ্টাও করি নি, কিন্তু গাধাঘোড়ার দলেও ছিলাম না। তখন আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কাছাকাছি সময়। শশাঙ্কদা আমায় বলল, 'তুই একেবারে গোল্লায় যেতে বসেছিস। অতবড় ফ্যামিলির ছেলে। খানিকটা বোধবুদ্ধি তোর হওয়া উচিত। শুধু হল্লা করে বেড়ালে কি চলে? চারপাশের অবস্থাটা তাকিয়ে দেখ। বোঝবার চেষ্টা কর। আজকের দিনে গা ভাসিয়ে থাকলে চলে না। কিছু তোকে করতে হবে, সোসাইটিতে আমাদের মতন মানুষের একটা পার্ট আছে প্লে করার। বুঝলি।...কি, আর এক কাপ খাবি নাকি? খা খা, আজ বেশ শীত।'...শশাঙ্কদা আমায় জ্ঞান দিতে লাগল। তারপর থেকে প্রায়ই, দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছি দেখলেই শশাঙ্কদা ডাকত—'এই যতি, শুনে যা।' শশাঙ্কদা আমায় সাম্রাজ্যবাদ, শোষণ, বুর্জোয়াদের ধাপ্পা, কংগ্রেসের জুয়াচুরি, মজদুর দুনিয়ার ভবিষ্যৎ, এইসব বোঝাবার চেষ্টা করত। মাঝে মাঝে হাতে কাগজ গুঁজে দিত। বাংলা চটি চটি বই। বলত: 'প্রগ্রেসিভ থিংকিং কর..., আস্তে আস্তে তোর চোখের সামনে থেকে এতকালের পরদা সরে যাবে।'...এই সময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। দেশ ভাগ হয়ে গেল। আমি বিহারের মফস্বল শহরের ছেলে, দেশ ভাগের কিই বা বুঝব, শুধু শুনলাম পূর্ব বাংলা থেকে হাজারে হাজারে হিন্দু পশ্চিম বাংলায় চলে আসছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন আমাদের শেরপুরের কি চেহারা, যেন ফাগুয়া আর দেওয়ালী একসঙ্গে হচ্ছে। তামাম শহরে হই হই, কত বাড়িতে আলো দিয়ে সাজালো, স্টেশনে কাগজের পতাকা দুলতে লাগল সারা প্লাটফর্ম জুড়ে, আমাদের নীচুবাজারে পটকা ফাটতে লাগল; বোঁদে বিলি হতে লাগল, রাজাবাবু দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গোলাপ জল ছড়াতে লাগলেন। শশি, সেই দিনটা কেন যেন আমার অসম্ভব ভাল লেগেছিল। কে স্বাধীন কার স্বাধীনতা, ভারতবর্ষ—সে কত বড়, তার প্রাণে কি আছে—কিছুই তো বুঝি নি—তবু অত মানুষের আনন্দ আর উল্লাসের মধ্যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের বেণীনন্দনবাবু, যাঁকে পুলিশ কুইট্ ইন্ডিয়ার সময় গ্রেপ্তার করেছিল, করে হাজারিবাগ জেলে রেখেছিল, সেই বেণীনন্দনবাবু ছাড়া পেয়ে গেছেন তখন। মানিকবাবু জেলেতেই মারা গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা দিবসের দিন—স্টেশনের কাছে বড় ফুটবল মাঠটায় মিটিং ছিল। বেণীনন্দনবাবু বলবেন। মাঠটা খুব সাজানো হয়েছিল; সালু ঝুলিয়ে, পতাকা উড়িয়ে, দেবদারু গাছের পাতা

বেঁধে মাঠের চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সারা শহর ভেঙে পড়েছিল মাঠে। ছেলেমেয়ে বুড়ো বুড়ি কেউ বাদ যায় নি। তুমিও গিয়েছিলে শশি, তুমি শাড়ি পরে, চুল বেঁধে মাঠে গিয়েছিলে। আমি তোমায় মেয়েদের দিকে বসিয়ে দিয়েছিলাম। বেণীনন্দনবাবু এলেন। তাঁকে মালা দেওয়া হল। হাত-জোড় করে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন, সারাক্ষণ কাঁদছিলেন, তারপর গলার মালা খুলে রেখে বললেন : এই মালা গলায় পরার অধিকার তাঁর নেই। তবু লোকের মনে কষ্ট হবে বলে তিনি পরেছেন। এই মালার আসল মালিক মানিকবাবু। 'হামারে মানিকদাদানে জেলকে অন্দর মর গিয়া। কাহে? ইস্ বাস্তে কি মানিকদাদানে জিন্দেগী ভর্ সাচ্চা আদমি রহ গিয়া। আপনা ফিকির উনোঁনে না কিয়া, ধান্দামে নেহি ঘুমা, হামারা দেশ, হামারা জনমভূমি —ভারতমাতাকি সেবাকে লিয়ে, আজাদীকে লিয়ে অপস যো কুছ থা সব কুরবানি কর দিয়া।' সাচ্চা আদমি কে? যে মানুষ লালচ রাখে না, মতলব নিয়ে ঘোরে না, যার লড়াই মানুষের ভালোর জন্যে, গরীবের ভাত ডাল কাপড়ের জন্যে।...এই স্বাধীনতা আমাদের হাতে ক্ষেতীর মতন এসেছে—এখন এ আমার তোমার সকলের ক্ষেতী; যদি ফসল ফলাতে চাও—সাচ্চা আর পরিশ্রমী হতে হবে। গোলামীর যুগ শেষ হয়েছে, এবার তোমার ক্ষেত, তুমি তাতে ফসল বোনো।...বিস্তর হাততালি পড়েছিল বেণীনন্দনবাবুর বক্তৃতার পর, তারপর উঠলেন উকিল ইব্রাহিম মিয়া। বললেন, কে হিন্দু, কে মুসলমান —এ নিয়ে ঝগড়া করার দরকার নেই। এই শেরপুরের মাটিতে আমরা পুরুষানুক্রমে বাস করছি। এই শহর আমাদের। আমরা ভাইয়ের মতন থাকব, বন্ধুর মতন। বাইরের বাতাস যেন আমাদের দূষিত না করে।...মিটিং যখন শেষ, ঠিক তখন লালঝাণ্ডাদের একটা দল চুপি চুপি আড়াল থেকে হাঁক দিল 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়।' ওই মাঠে, ওই সময়ে এই হাঁক যেন বজ্রপাতের মতন। সবাই থমকে গেল। তারপর রাগে, ক্ষোভে, বিরক্তিতে, ঘৃণায় ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর। তারা তখন পালাচ্ছে। কে কোথা দিয়ে পালাচ্ছে ঠিক নেই। আমি, বাসু, জানকি আমরা গোটা দুয়েককে তাড়া করে যখন রেল ফটকের সামনে ধরে ফেলে মারছি তখন ঝাণ্ডা পার্টির আরও ক'জন সোডা লেমনেডের বোতল ছুঁড়তে লাগল। আমরাও পিয়ারীর পানের দোকানে যত সোডার বোতল ছিল নিমেষে শেষ করে ফেললাম, বাসু জখম হল।...তারপর কিছুদিন ঝাণ্ডা পার্টি শহরে বেরুতো না। শশাঙ্কদা আমার ওপর চটে গেল। কথা বলত না। ডাকত না দোকানে। না ডাকুক। তোমার কি কুসুমদাকে মনে পড়ে? শশাঙ্কদার বন্ধু—কিন্তু ফাঁক পেলেই শশাঙ্কদাকে ঠুকত। কুসুমদা বলত : 'চুপ কর বেইমান—কথা বলিস না, তোরা সেদিনও বেইমানী করেছিস, কংগ্রেসের লোক ধরিয়ে দিয়েছিস, সাম্রাজ্য-

বাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ করেছিস। তোরাই আগে পার্টিসানের কথা বলেছিলি। আজ সাধু সাজছিস!...শশাঙ্কদা দোকান সাজিয়ে বসে আছে যখন, তখন সেখানে যাবার অধিকার সকলেরই আছে। আমরা যেতাম। শশাঙ্কদা আমাদের এড়িয়ে থাকত। বেচারীর অবস্থাও দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। বিয়ে করল দুম্ করে; করে ডোমপাড়ায় হাঁস-মুরগী পালতে লাগল। দেখতে দেখতে সময় পালাচ্ছিল। আমাদেরও পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসছে। এখন শশাঙ্কদা আবার ভাব জমাল আমার সঙ্গে। বলল, 'তোদের হেডমাস্টার মশাই তো অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন।' কথাটা শুনেছিলাম। জোর গুজব ছিল স্কুলে। শুনেছিলাম, হেডমাস্টার মশাই মজঃফরপুর না মোতিহারী কোথাকার স্কুলে চলে যাচ্ছেন। শশাঙ্কদা বলল, গুণেন স্যার না তারকপ্রসাদ কে হেডমাস্টার হবে তাই নিয়ে দলাদলি হচ্ছে। মাস্টাররা দুটো দল করে ফেলেছে। একদল চাইছে আগের মতন বাঙালী হেডমাস্টার থাক, আরেক দল চাইছে বিহারী হেডমাস্টার। তারকপ্রসাদজী কিন্তু ইউ পি-র লোক। শশাঙ্কদা বলল, 'বুঝলি যতি, গুণেনবাবু কোয়ালিফায়েড, কিন্তু তারকপ্রসাদজী হিন্দীঅলা। আমরা বিহারে থাকি বলে কি কোনো ভয়েস থাকবে না? সিনিয়ারমোস্ট টিচার। তারকপ্রসাদ বলছে সে এম এ, বি টি। তাতে কি? তার টিচিং এক্সপেরিয়েন্স কম। তোদের একটা কিছু করা উচিত।' গুণেনবাবু কতটা জ্ঞানীগুণী জানতাম না, তবে বড় পরিবারের মানুষ, কোলিয়ারীতে এক ভাই ম্যানেজার, অন্য ভাই রেলের ডাক্তার হয়েছে কোথায়। গুণেন স্যার লোক ভাল নয়, গরম মেজাজ নিয়ে থাকে, ছেলেদের বড় হেনস্থা করে, কথায় কথায় গালাগাল দিয়ে বলে: 'চাষ করো গে যাও হে, বাপকে বলো লাঙল কিনে দিতে, তোমার মতন বলদ তো রয়েছেই। যত চাষা, গাধা এখানে এসে জুটেছে। টেল্ ইওর ফাদার, দিস স্কুল ইজ নট এ ক্যাটল শেড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?'...সেই গুণেন স্যারকে হেডমাস্টার করার জন্যে আমাদের মাথাব্যথার কোনো দরকার ছিল না। তা ছাড়া আমরা কে? আমাদের অধিকারই বা কি? কিন্তু শশাঙ্কদা রোজই কানের কাছে মন্তর দিতে লাগল, বলল, প্রতিবাদ না করলে অন্যায় হবে। বাঙালী মার খেয়ে যাবে। তারক-প্রসাদজী খুব বুদ্ধিমান ছিলেন না। দলাদলির ব্যাপারটা সামলাতে না পেরে একদিন রাগের মাথায় আমাদের হেমবাবুকে অপমান করে বসলেন। ব্যাস্, ছুতো পাওয়া গেল। আমাদের স্কুলে একটা শখের সায়েন্স ল্যাবরেটারী ছিল, চাঁদার পয়সায় তৈরী, বদ্যিনাথবাবুর প্রাণ। সেই ল্যাবরেটারী আমরা ভেঙে তছনছ করে দিলাম, তারকপ্রসাদজী বাঙালী মাস্টার আর ছাত্রদের ঘৃণা করেন, গালাগাল দেন—এসব রটিয়ে দেওয়া হল। শেরপুরে বেহারী-বাঙালী ঝগড়া লাগাবার উপক্রম করেছিল শশাঙ্কদা। বেণীনন্দনবাবু তখন প্রেসিডেন্ট

স্কুলের। তিনি অবস্থাটা সামলে নিয়ে নতুন হেডমাস্টার নিয়ে এলেন। তিনি অবশ্য বাঙালী।...তোমায় বলছি শশি, সেদিনও আমি জিতেছিলাম। আমার কথায় বাসুরা ল্যাবরেটরী চুরমার করেছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমরা যা করছি—ঠিকই করছি, প্রতিবাদ করছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বাঙালী বলে তোমরা আমাদের অবহেলা করবে, উপেক্ষা করবে, অন্যায় করবে? কখনো নয়।...সব বুঝেও একটা জিনিস বুঝি নি। গুণেন স্যার হেডমাস্টার হলে শশাঙ্কদা একটা চাকরি পেত। হয়ত কেরানীর চাকরি। ধুমসী বউ, হাঁস-মুরগী আর চায়ের দোকান নিয়ে লোকটা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। কোনোদিক সামলাতে পারছিল না। পারলও না শেষ পর্যন্ত, দোকান তুলে দিল।

স্কুলের জীবন এইভাবেই শেষ হল। আরও কত কি কাণ্ড করেছি। তারপর চলে গেলাম কলেজে পড়তে। ছুটিছাটায় শেরপুরে আসতাম, থাকতাম। কলেজে পড়তে গিয়ে আমি আবার শশাঙ্কদার পার্টির লোকদের খপ্পরে গিয়ে পড়লাম। আমার নতুন নতুন জ্ঞান জন্মাতে লাগল। বুঝতে শিখলাম, বা আমায় শেখানো হতে লাগল : সাদা চামড়ার সাম্রাজ্যবাদ গিয়েছে, কিন্তু বাদামী কিংবা কালো চামড়ার সাম্রাজ্যবাদ গলায় এঁটে বসছে, কিষাণ-মজুররা কিছু পায় নি এই স্বাধীনতায়, তারা এখনও দু টাকা আড়াই টাকা হাজরিতে কাজ করে, তারা খেতে পায় না, পরতে পারে না, রাস্তায় মরে, আর বড় লোকরা গান্ধীটুপী মাথায় দিয়ে ফুর্তি লোটে, ব্যবসা করে, বড় বড় চাকরি পায়, তাদের জন্যে সব রাস্তা খোলা। কেন একটা লোক সারাদিন পরিশ্রম করে পরিবার প্রতিপালনের মতন অর্থও পাবে না, আর কেন একটা লোক ভেজাল বেচে রাজার হালে থাকবে? কথাটা তো মিথ্যে নয় শশি, ভারত স্বাধীন হল কিন্তু ভাগাড়ে শকুন পড়ার মতন যত লোভী, ধূর্ত, শয়তান, ফন্দীবাজরা ভিড়ে গেল স্বাধীনতা লুটতে। আমাদের বেণীনন্দনবাবুর মতন মানুষকেও চারপাশ থেকে চাপতে চাপতে পঙ্গু করে দিল ওরা।

তখন এমন একটা হাওয়া বইছে যে, আমাদের বয়েসী ছেলেরা যদি জীবন্ত থাকতে চায় তবে তাদের অন্যদিকে মতিগতি ফেরাতেই হবে। আর আমার বেলায়, হীরো হবার নেশা ঢুকে গেছে। লাগসই, চমকদার, জবরদস্ত কিছু করতে না পারলে হীরো হওয়া যায় না। আমি ক'মাসেই প্রগ্রেসিভ হয়ে উঠলাম। মানে, লাগসই সব কাজ করতে লাগলাম। কলেজে হাংগার স্ট্রাইক করলাম। কেন করলাম? কারণটা তুচ্ছ। কলেজ থেকে দুটো ছেলেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল গর্হিত অপরাধের জন্যে। তাতে কি? আমায় হীরো হতে হবে তো! হাংগার স্ট্রাইকের পর আরও এক ধাপ চড়লাম, কলেজের গেটের সামনে গাড়ি পোড়ানো হল, ভাড়াটে গাড়ি, ছেলেদের সঙ্গে বচসা করার জন্যে। মাস কয়েক পরে—কি বছর খানেক বাদে কলেজ সোস্যালে

জহরদা আমাদের প্রিন্সিপালকে নকল করে ক্যারিকেচার করছিল, প্রফেসাররা আপত্তি জানালেন, প্রিন্সিপাল রেগে লাল, সঙ্গে বউ মেয়ে রয়েছে, জহরদাকে ক্ষমা চাইতে বললেন। আমরা বললাম, ক্ষমা চাওয়া হবে না, এটা একটা ফাংসান, ক্যারিকেচার ইজ ক্যারিকেচার। ওই নিয়ে লেগে গেল ছাত্র ভার্সেস টীচার। পরের দিন আমার নেতৃত্বে প্রিন্সিপালের বাড়ির সামনে এফিজি পোড়ানো হল, প্রিন্সিপাল যে কত বড় শয়তান তার ফিরিস্তি দাখিল করে ফেললাম বানিয়ে বানিয়ে। পুলিশ এসে আমাদের পেটালো। হাত ভেঙে আমি আরও বড় নেতা হয়ে গেলাম।...কিন্তু এ-খেলার কতটুকু স্থায়িত্ব! আমি ভিড়েছিলাম হীরো হবার জন্যে। শৌখিন মাতাল যেমন মদের দোকানে ঢোকে মাতলামির বহর দেখাতে—আমারও সেই হাল হল। ওসব শখের ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে নিজের আখেরের দিকে তাকালাম।

অবশ্য তার আগেই শেরপুরে এসে আমি বাসুদের নিয়ে অনেক কেচ্ছার কাজ করেছি। মুসাফিরখানা ঘেরাও করে মারপিট, পাড়ার চাটুজ্যেমশাইকে সাইকেলের ধাক্কা মেরে নালায় ফেলে দিয়েছি, নীচুবাজারে হরতাল করিয়েছি। আর তোমাদের সঙ্গে যা করেছি তার তুলনা নেই।

শশি, আমি জানি, তোমাদের সঙ্গে আমি কি কি দুর্ব্যবহার করেছি। আমার কথায়, পরামর্শে তোমাদের ওপর কি কি অত্যাচার করা হয়েছে। ধরো, মায়ামাসি। মায়ামাসিকে নিয়ে আমাদের পাড়ায় অনেক কেলেঙ্কারী হয়েছিল। তুমি জানো, মায়ামাসি কেমন ধরনের মেয়ে ছিল। আমি ছেলেবেলা থেকেই অনেক কথা শুনতাম, দেখতাম, বুঝতাম খানিকটা খানিকটা, কিন্তু কিছু বলি নি। তখন তোমাদের বাড়ি আমার যাতায়াত ছিল নিত্য, মায়ামাসি আমার গাল টিপে দিত, নারকোলের নাড়ু দিত খেতে, কানের ময়লা পরিষ্কার করে দিত, আমের আচার খাওয়াত। ভালবাসত নিশ্চয়। কিন্তু যে ভালবাসে তার দোষ কি দোষ নয়, না সে-দোষ চোখ ফিরিয়ে না দেখে থাকা যায়! তোমার সঙ্গে আমার গলায় গলায় ছিল বলে আমি মায়ামাসির দোষ না দেখে থাকতে চাইতাম। আমার বন্ধুরা খারাপ খারাপ কথা বলত। আমি তোমাদের বাড়িতে মায়ামাসিকে নিয়ে ঝগড়াঝাটি হতে দেখেছি। তুমি নিজেই আমায় বলেছিলে—মাসিকে কারা কারা চিঠি লেখে, কারা রুমালে আতর মাখিয়ে ফেলে দিয়ে যায়, কে তোমাদের বাড়ির সামনে জানলা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গান গেয়েছে: 'সেদিন সাঁঝেতে অভিমান করি—ভুলিয়া গেছিলি বাঁধিতে কবরী...।' তোমার মুখ থেকে শুনেও আমি কিছু করি নি। কিন্তু নিন্দেটা এমন করে রটতে লাগল যে কান পাতা দায়। আমাদের বাড়ির লোকজন পর্যন্ত তোমাদের বাড়ির সঙ্গে আসা-যাওয়া বন্ধ করল। আমি তখনও তোমার সঙ্গে মেলামেশা করি, খানিকটা আড়ালে অবডালে, লুকিয়ে আমরা মাঠে বেড়িয়ে এসেছি,

সার্কাস দেখেছি, দুর্গাপুজোর সময় নতুন পাড়ায় ঠাকুর দেখতে গিয়েছি, কালী পুজোর সময় তোমায় রঙমশাল কিনে দিয়েছি, হাউই উড়িয়েছি তোমার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে। তখন তুমিও বড় হয়েছ, আমিও বড় হয়েছি। তুমিও বোঝো, আমিও বুঝি। একদিন তুমি সন্ধ্যেবেলায় কোন বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিলে—আমার সঙ্গে দেখা হল। আমরা যখন তোমার বাড়ির কাছাকাছি এসেছি, দেখলাম মায়ামাসি জানলায় দাঁড়িয়ে ফরসা গোছের একটা ছেলের জামা টেনে পকেটে কি গুঁজে দিচ্ছে। তুমি বললে: 'মাসি আজকাল ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে আদিখ্যেতা করছে।' এই বলে তুমি আমায় ঠেলে সরে যেতে বলে হনহন করে বাড়ির দিকে চলে গেলে। মায়ামাসি বড় বেশী আদিখ্যেতা করছিল। দুর্নামে দুর্নামে ছেয়ে গেল। কেউ বলত, মায়ামাসি পালাবে, কেউ

গেছে। তুমি বললে : ইণ্টারভেলের সময় তুমি বেরিয়ে আসবে মাথা ধরেছে, গা বমিবমি করছে বলে, তারপর আমরা দুজনে বেড়িয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফিরব। আমি রাজী হয়ে গেলাম। তুমি শশি, বইয়ের মাঝখানে উঠে এলে, আমি বাইরে এসে দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছ। দুজনে তাড়াতাড়ি সিনেমা হাউসের পেছন দিয়ে মাঝপাড়ার রাস্তা ধরলাম। রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে ডোম-পাড়ার গা দিয়ে আমাদের পাড়ার পেছন দিকে এসে উঠেছে। অনেকটা রাস্তা। মাইল খানেকেরও বেশী। সেই পুকুরটা পেরিয়ে গেলে একেবারে ফাঁকা পাথর-ওঠা পথ। মাঠের মধ্যে তেঁতুল আর হরতুকী গাছ, ছোট ছোট ঝোপ। রাস্তায় আসতে আসতে আমরা কত রকম গল্প করছিলাম। গল্প করছিলাম, হাস-ছিলাম, হাত ধরাধরি করে হাওয়ায় দোলাচ্ছিলাম, তুমি আমার পিঠে কিল মারছিলে, চিমটি কাটছিলে হাতে, আমি তোমার কাঁধে ঠেলা মারছিলাম, কোমরে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিচ্ছিলাম, কাতুকুতু দিচ্ছিলাম। সেদিন রাস্তাঘাট খুব অন্ধকার দেখাচ্ছিল। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করে তারা জ্বলছিল রাশি রাশি। তুমি দু-একবার সেই গানটা ভাঙা ভাঙা করে গাইলে, কি যেন গানটা, আমার আর মনে পড়ে না। তারপর আচমকা আমায় বললে : 'তুই নাকি আমার নামে কি বলেছিস?' 'আমি! কি বলেছি?' 'কি বলেছিস জানিস না?' 'না।' 'যতি, তুই আমার কাছে চালাকি করিস না; আমি তোর সব খবর জানি। তুই তোর বন্ধুদের কাছে বলেছিস আমি তোকে চিঠি লিখি!' 'না, আমি বলি নি।' 'তুই বলেছিস, আমি তোর জন্যে ছটফট করে মরে যাচ্ছি।' 'কেন বাজে বকছিস! আমি এসব কথা বলি নি। আমার বন্ধুরা তোদের কথা জানে। তারা মজা করেছে।' 'তুইও আমায় নিয়ে মজা করিস!' 'বেশ করি। তুই কে রে, তোকে নিয়ে মজা করা যাবে না!'...হঠাৎ তুমি খুব চটে গেলে শশি, একেবারে হুট করে। বললে, 'আমি তোর মজার জিনিস! আমাদের বাড়ি নিয়ে তোরা মজা করে যাবি? ছোটলোক, চামার কোথাকার!'...আমার মাথায় হঠাৎ রক্ত চড়ে উঠল, দপ্‌ করে। তুই আমায় ছেলেবেলা থেকে লক্ষবার গালাগাল দিয়েছিস, ছোটলোক ইতর চামার অসভ্য পাজী—কত কি বলেছিস. কিন্তু সেদিন কেন যে আমার মাথায় রক্ত ছলকে উঠল কে জানে! আমি তোর গালে সটান একটা চড় কষিয়ে দিলাম। এত জোরে মেরেছিলাম যে, আমার নিজের হাতেই লাগল। তুই থমকে গেলি, যন্ত্রণায় শব্দ করলি, তারপর কেঁদে ফেললি। আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললাম—'হ্যাঁ, তুই মজার জিনিস। তোদের বাড়িতে কত মজা হয় আমি জানি না! তোরা চোর, ছোটলোক, খচ্চড়, হারামি তোরা।'... তুমি জোরে জোরে কাঁদছিলে, ফুঁপিয়ে, আমাদের বাড়ি তখনও অনেকটা দূরে, সেই অন্ধকারে আমি তোমায় ফেলে রেখে হনহন করে চলে গেলাম। পিছু ফিরে একবারও দেখলাম না—তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, ভয় পেয়েছ কি না,

কেমন করে তুমি আসবে!...শশি, তোমার সঙ্গে আমার সেই শেষ কথাবার্তা। আর কোনোদিন আমি তোমাদের বাড়ি যাই নি, রাস্তায় তোমার সঙ্গে দেখা করি নি, হঠাৎ মুখোমুখি হলে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিতে, আমিও অন্যদিকে তাকাতাম। জানি না, এই জন্যেই কিনা, তোমাদের ওপর আমার আক্রোশ আরও বেড়ে গেল। তোমাদের জব্দ করার জন্যে আমি আমার দলবল নিয়ে উঠে-পড়ে লাগলাম। তোমাব বাবা—নৃসিংহকাকা তখন মিউনিসিপ্যালিটির টাকা মারার ব্যাপারে ফেঁসে গেছে, তোমার মাসি ব্যাংকের সেই ছেলেটার সঙ্গে আদিখ্যেতা করছে...আমরা তামাম পাড়া, নীচুবাজার, মিউনিসি-প্যালিটির অফিসে তোমাদের নামে কেচ্ছা কেলেঙ্কারি রটাতে লাগলাম। তোমার বাবার নামে হাতে-লেখা পোসটার মারলাম দেওয়ালে দেওয়ালে, গাছের গায়ে, বাজারে, তোমার মাসির ছবি আঁকা হল ভূষোকালিতে, কদাকার ছবি, বুক খুলে দাঁড়িয়ে আছে। দলবল নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে গিয়ে চেঁচালাম, কত কীর্তিই করলাম। শশি, আমি যে আমার দলবলকে তোমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিলাম তাও সত্যি, তবে আমি কিন্তু একথা বলি নি যে, তোমার নামে কেচ্ছা লিখে বাড়ির দরজায় সেঁটে দিয়ে আসতে। এটা ওরা করেছিল। আমি নয়।

তোমরা শেরপুর ছেড়ে যেতে বাধ্য হলে। আমাদের জন্যেই গিয়েছিলে, এটা কিন্তু ঠিক নয়, তোমাদের আর উপায় ছিল না। আমরা শুধু নিমিত্ত মাত্র। তোমরা চলে গেলে, আমিও আর বেশীদিন শেরপুরে আসা-যাওয়া করি নি। কলেজ শেষ করে চলে এলাম কলকাতায়। বাবা আমার ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর মানসম্মান ধুলোয় লুটোচ্ছিল, মতিকে তিনি কড়া হাতে আগলাচ্ছিলেন। আমি কলকাতায় এসে আবার পড়তে শুরু করলাম ইউনিভারসিটিতে, ল' ক্লাসেও যেতাম। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক দিন দিন পাতলা হতে লাগল। শুধু মাসকাবারি টাকার সম্পর্ক। ছুটির মধ্যেও পাঁচ-সাত দিনের জন্যে যেতাম মাত্র।

ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়েস থেকে আমার নিজের জীবন শুরু হল। বাড়ি নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা থাকল না, গা থাকল না, টানও নয়। যতিকিশোর মিত্র নিজের জীবন গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেরিয়ার যাকে বলে। কেরিয়ারের জন্যে আমি আদাজল খেয়ে লাগলাম। একটা গুণ আমার আজন্মই আছে : আমি ধূর্ত, নিজের ভাল কেমন করে করতে হয় এ-জগতে আমার জানা আছে, আমার মনের জোর, সংকল্প সহজে টলে না। আজীবন আমি যা করেছি—তাকে তুমি হেলাফেলা করতে পারবে না, মানে সেই দিক থেকে দেখলে, আমি একের পর এক জিতের খেলা খেলে এসেছি, উইনিং গেম্, হার আমার কাছে লজ্জার বিষয় ছিল। শেরপুরের একটা সাধারণ ছেলে,

মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ, আজ ওয়ারেন অ্যান্ড কুপার্সের সিনিয়ার এক্সিকিউটিভ্, প্রায় প'চিশ শো টাকা মাইনে, মীনার মতন একটা বউ—যাকে ডগ্ শোয়ে নামিয়ে দিলে বাজি মাত করে আসবে।

যাক গে...জীবনের একটা সময় আসে যখন পায়ের মাটি হঠাৎ কেমন কাঁপতে শুরু করে। অন্তত আমার করেছিল। চল্লিশ পেরিয়ে এসে একদিন দুঃস্বপ্ন দেখলুম, যতীকিশোরের জামা-প্যান্ট জুতো-মোজা টাই-রুমাল সব উড়ে যাচ্ছে বাতাসে, যতীকিশোরের ঠ্যাং খুলে গেল, হাত খুলে গেল কাচকড়ার পুতুলের মতন, খুলে ঝুলতে লাগল বাতাসে, তার ধড় পড়ল সিঁড়িতে, মাথাটা ফ্রিজের মধ্যে বসানো থাকল, আর হৃদ্‌পিন্ডটা বিছানায় পড়ে চারপাশ ফাঁকা হয়ে গেল, আমি একেবারে এসে আমার সব উদ্যম থেমে গেল, মন ভেঙে গেল, বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগল, চারপাশ ফাঁকা হয়ে গেল, আমি একেবারে একা নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। কতদিনের ক্লান্তি বিষাদ অবসাদ আমায় জড়িয়ে ধরল। এমন নিঃসঙ্গ যে, আমার মনে হত, আমি নিজের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত কুয়ার মতন পড়ে আছি। এই নিঃসঙ্গতা আমায় ভূতের মতন তাড়া করে বেড়াত। বুঝতে পারতাম না কেন এমন হল? কেন? পেছন ফিরে তাকাতাম। বার বার। কারণে অকারণে। শেষে আমার মনে হল, এতকাল যে খেলা খেলে এসেছি, সে-খেলা জয়ের নয়। আমি প্রতিবার ভেবেছি, আমি ন্যায্য খেলা খেলছি এবং জিতছি। সেই স্কুলের ঘটনা থেকেই। কিন্তু এতকাল পরে অনুভব করলাম, প্রত্যেকটা খেলাই ছিল হারের, মানুষ ও-খেলায় শেষ পর্যন্ত জেতে না। তোমার কি মনে হয় না শশি, আমরা যে হাওয়ায় মানুষ হলাম, আর যে-হাওয়ায় জীবন প্রায় ফুরিয়ে ফেললাম—সেই হাওয়া বড় প্রবঞ্চক। এই হাওয়া আমাদের অবিশ্বাস, সন্দেহ করতে শিখিয়েছে, হিংস্র নির্মম হতে শিখিয়েছে, আমাদের উন্মত্ত করেছে, লোভী করেছে; আমরা রুক্ষ নির্দয় চোর ভাঁড় হারামজাদা শয়তান হয়ে উঠেছি। অন্তত আমি অনুভব করেছি, আমার আর কিছু নেই, পুরোপুরি হেরে গিয়েছি।

এই সময় একদিন, অফিস থেকে যখন বাড়ি ফিরছি, আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা জায়গায় কতকগুলো ছেলে একটা গাড়ি থামিয়ে গোলমাল করছিল। গাড়িতে এক বুড়ো মতন ভদ্রলোক, আর, পাশে তাঁর মেয়েটেয়ে হবে। প্রয়োজন ছিল না, তবু এগিয়ে গেলাম, কলকাতার রাস্তা আর ওই ছেলের দল কারও অজানা থাকার কথা নয়। ভদ্রলোককে ততক্ষণে গাড়ির বাইরে বের করে এনেছে ক'টা ছেলে, আর ক'টা মিলে মেয়েটার গাল টিপছে, হাতে থু থু লাগিয়ে বুকে মাখিয়ে দিচ্ছে। সে এক বিশ্রী অসহ্য অবস্থা। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই একটা ছেলে বলল : শালা গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরেছে। বুড়ো ভদ্রলোক প্রায় কেঁদে উঠে

বললেন : মিথ্যে কথা। ওরা রাস্তা ছেড়ে সরে যাচ্ছিল না, অনেকবার হর্ন দিয়েছি, আলো ফেলেছি। পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম। আমি ধাক্কা মারি নি। একটা ছেলে গাড়ির বনেটের ওপর ইচ্ছে করে হাত রেখে পড়ে গেল!...ব্যাপারটা আমার জানা, মদ খাওয়া আর জুয়া খেলার টাকার দরকার হয়েছে, ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বুড়ো ভদ্রলোককে জব্দ করছে, বিশেষ করে গাড়িতে যখন মেয়ে আছে।...আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'কত টাকা চাই?' 'একশো।' 'আমি দিচ্ছি—ওঁকে ছেড়ে দাও।' 'আপনি মোশাই ডিজেল ছাড়ছেন।' 'টাকা দেব। ওঁকে ছেড়ে দাও।' 'আরে লেনটু, আগে খাঁচা দেখে লে, পরে ছাড়বি।' 'টাকা দেখবে? বেশ...।' অ্যাটাচি কেস খুলে টাকা বার করলাম। দেখালাম। 'আগে ওঁকে ছেড়ে দাও, যেতে দাও, পরে টাকা দেব।'... ভদ্রলোককে ওরা ছেড়ে দিল। ভদ্রলোকের তখন এমনি অবস্থা—লজ্জায় গ্লানিতে অপমানে আমার দিকে আর না তাকিয়ে কোনো রকমে গাড়ি নিয়ে পালালেন। এই সময় আমি দেখলাম, মীনা বাড়ি থেকে আসছে ট্যাক্সি করে। আমার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হাত দেখাতেই ট্যাক্সি দাঁড় করাল মীনা। কোনো কথা না বলে ট্যাক্সির দরজা খুলছি, একটা ছেলে আমার হাত ধরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী অ্যাটাচি কেসটা তার মুখের ওপর মারলাম। শুয়ারের বাচ্চা চেঁচিয়ে উঠল। শেরপুরে বোধ হয় এইভাবেই গোপীব মুখে হকি স্টিক ঝেড়েছিলাম।...ট্যাক্সির মধ্যে আমি ঢুকে পড়েছি ততক্ষণে, ট্যাক্সিঅলা ভয় পেয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। মীনা থতমত খেয়ে গিয়েছিল, বলল, 'কি? ব্যাপারটা কি?' 'কিছু না। ছিনতাই করবার মতলবে ছিল।'

পরের দিন, সামান্য দেরী করেই ফিরছিলাম অফিস থেকে; বেরিয়ে এসে সামান্য মদ্যপান করেছিলাম, অকাল বৃষ্টি নেমেছিল, হয়ত তাই। বাড়ির রাস্তায় আসতেই দেখতে পেলাম—কালকের সেই দল। ওরা ধীরে ধীরে চারপাশ থেকে আমায় ঘিরে ফেলছিল। রাস্তার দু-তিনটে বাতি জ্বলছে না, কাজটা ওদেরই। ওরা আমায় ঘিরে ফেলছে বুঝতে পারলাম, দেখতে পেলাম, আমার হাতে অ্যাটাচি কেস; ওদের হাতে ছোরা, সাইকেলের চেন। যতিকিশোর সবই জানে—তার কাছে নতুন কিছু নয়, এ অস্ত্র রকমফের করে তার হাতেও ছিল একদিন। চেষ্টা করলে আমি নিজেকে হয়ত বাঁচাতে পারতাম, হয়ত বাঁচতাম। কিন্তু আমার কী যে হল, আমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম না, চেঁচালাম না, ছোটবার জন্যে পা বাড়ালাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলাম। ওরা এল, চারদিক দিয়ে গোল হয়ে ঘিরে। সামান্য নেশার মাথায় আমার মনে হল, যতি, কি যায়-আসে—কি তোমার যায়-আসে এ-জীবনে! ওরা তো তোমারই কীর্তি।...শশি, আমি একটুও নড়ি নি, চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন কি যে-ছেলেটা

ভোজালি তুলল, তাকেও দেখলাম।......তারপর পলকের মধ্যে অনুভব করলাম পেটে আমার অসহ্য যন্ত্রণা...

'শশি ?'

যতিকিশোর চারপাশে তাকিয়ে সরসীকে দেখতে পেল না। চারদিকে মোহন-জ্যোস্না। আকাশ যেন অকৃপণ হাতে জ্যোৎস্না ঢেলে দিয়েছে। আকাশে মেঘ নেই। সমস্ত মুখ নরম রুপোয় টলটলে করে চাঁদ গড়িয়ে যাচ্ছে। ঝিম-ঝিম করছে চারপাশ। মাঠ ঘাস লতাপাতা চাঁদের কিরণে ভিজে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডান হাতে সেই ছোট্ট গ্রাম। ঝোপের মতন দেখাচ্ছে।

যতিকিশোর সরসীকে দেখতে না পেয়ে উঠল। আজ তারা গণেশকুঠির পেছনের দিকে বেড়াতে এসেছে। শহরে যায় নি। কাল শেরপুর ছেড়ে ফিরে যাবে কলকাতায়।

দু-চারটে গাছ। কি গাছ যতিকিশোর দেখল না। হয়ত জাম, হয়ত হরিতকী। কিছু বুনো ঝোপ, লতা। যতিকিশোর এ-পাশে খুঁজল সরসীকে। শরতের বাতাস দিচ্ছে। ঠাণ্ডা, একটু যেন দমকা আছে।

"শশি ?"

যতিকিশোর নীচু জায়গা থেকে উঠে এল। সামনে অবারিত মাঠ আর জঙ্গল, দূরে চাঁদের আলোয় কালচে রেখার মতন আকাশ, মাটি, অরণ্য একাকার হয়ে গেছে। একেবারে স্তব্ধ চারপাশ। শুধু ঝিঁঝি ডাকছিল। কোথায় যেন জোনাকি উড়ছে।

সরসীকে দেখতে পেল যতিকিশোর। বড় একটা পাথরের ওপর বসে আছে।

যতিকিশোর এগিয়ে এল। দাঁড়াল পাথরের কাছে। সরসীর পরনে সাদা শাড়ি, পাড়ের রঙ লাল। জ্যোৎস্নায় মেটে লাল দেখাচ্ছিল। রুক্ষ চুল এলো খোঁপার মতন জড়ানো। সরসী পা ভেঙে হাঁটুতে হাত দিয়ে বসেছিল।

পাথরের ওপর বসল যতিকিশোর। কথা বলল না।

সরসীও নীরব।

বসে থাকতে থাকতে যতিকিশোর পাথরের ওপর হাত ঘষতে লাগল। লক্ষ করল। আবার হাত ঘষতে লাগল। "শশি, এই পাথর না সেইটে ?"

সরসী ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল।

"আমার মনে হচ্ছে সেইটে—। হ্যাঁ, এখানেই কোথায় ছিল।"

"কোন পাথর ?"

"সেই যে কারা বলত উল্কার টুকরো ছিটকে এসে পড়েছে। এই পাথরটাকে দিনের বেলায় দেখলে অন্য রকম লাগে।..."

"হতে পারে সেই পাথর।"

"তোমার মনে পড়ে না?"

"পড়ছে।"

যতিকিশোর বসে থাকল। আকাশের দিকে তাকাল। জঙ্গলের দিকে। মাঠঘাট দেখল। এই নিবিড় জ্যোৎস্না। সরসীকেও। বসে থাকতে থাকতে আবার সেই ব্যথা—পেটের দিকের ব্যথা অনুভব করল। ব্যথাটা পেট থেকে ওপরে উঠল, বুকে ছড়াল। গলায় টনটন করে উঠল।

সরসীর কাঁধ স্পর্শ করল যতিকিশোর। চুলের কাছে মুখ রাখল। সরসী যতিকিশোরের হাত কোলের ওপর টেনে নিল।

যতিকিশোর যেন ক্রমশই পিছিয়ে যেতে লাগল। যৌবনে। যৌবন থেকে আচ্ছন্ন অচেতন করে ফেলল। সরসীর শরীরের ঘ্রাণ যেন কত যুগ পরে ফিরে এসেছে। নাকে লাগছিল। আবরণের কিছুটা দূরে গেল। অস্ফুটভাবে যতিকিশোর বলল : শশি, শশি, শশি।...

সরসী অনুভব করল পাথরের ওপর তার পিঠ, মাথার তলায় পাথর।

যতিকিশোর একবার আকাশের দিকে তাকাল। তার বুকের তলায় শশী। মাথার ওপরে শশী, নীচে শশী।

সরসী তার দীর্ঘ চুম্বন শেষ করার আগেই চোখের জলে যতিকিশোরকে ভিজিয়ে দিল।

যতিকিশোর তার যৌবন থেকে শিশুকাল, শিশুকাল থেকে আরও কতদূরে—কত যুগান্ত দূরে চলে গেল, যেন সে এই উল্কাপিণ্ডের কোনো দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় আদিম জ্বলন্ত শরীরে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে, যেখানে সে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিতে চায়।

সরসী অস্ফুট করে বলল, "তুমি কাঁদছ?"

যতিকিশোর বলল, "তুমিও কেঁদেছ।"